দয়াল বন্ধুর ই-বুক (২)

ছবি যুক্ত করা হয়েছে

2nd E-Book of DayalBM

January-2025

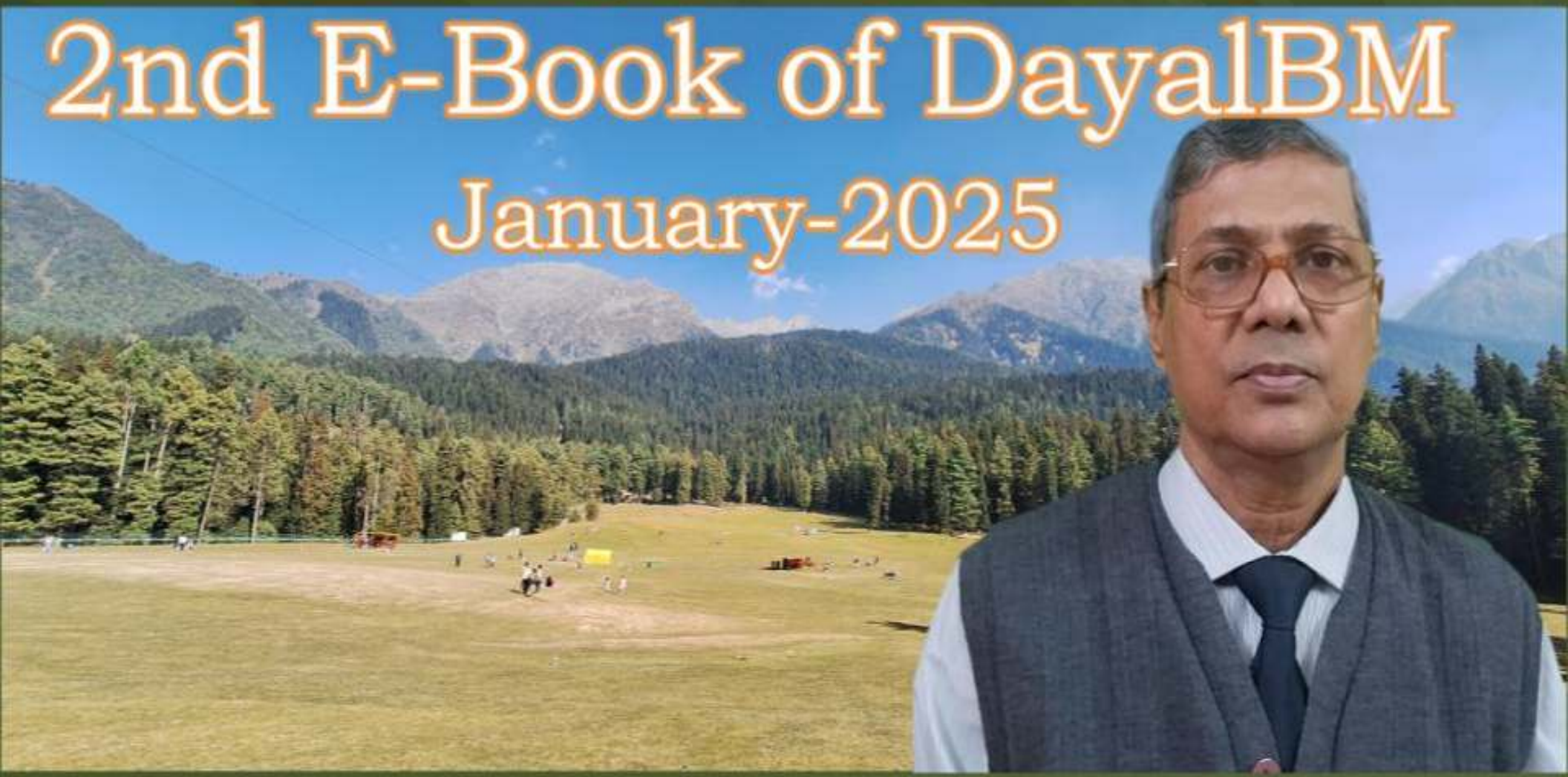

Page Numbers Added

২-য় ই-বুকের নিবন্ধ তালিকা

পৃষ্ঠা নং 2: সাফাই বা আমার বক্তব্য

পৃষ্ঠা 3; নে ঝোলা, চল ভোলা

পৃষ্ঠা 6; সিঁড়ি -১ পৃঃ 8; সিঁড়ি -২

পৃঃ 20: অকিঞ্চিৎকর একটা ফল

পৃঃ 22: এক ডাকাতির গল্প

পৃঃ 24: গীতার ২ য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক

পৃঃ 25: রাজ কর্মচারি

পৃঃ 27: লাফ

পৃঃ 30: লোপামুদ্রা

পৃঃ 32: সব নাগ সাপ নয়

পৃঃ 37: সর্ষের ফুল।

পৃঃ 41: সস্তা

পৃঃ 45: সাদা চামড়ার লোক

পৃঃ 50: সাপের কামড় - কি করণীয়

পৃঃ 55: কয়েকটি কালাচ সাপের কামড় এর রুগী

পৃঃ 62: হাতখান ধৈরে দেখ ক্যানে

পৃঃ 64: হাতি।

পৃঃ 68: হাদু মাছ

পৃঃ 70: হোষ্টেল। পৃঃ 75: লক্ষী দিদি

পৃঃ 78: নাম করণের সার্থকতা

পৃঃ 81: সামান্য ফলের বিপুল সম্ভাবনা

পৃঃ: 84: ঘাট।

পৃঃ 88: সাপুড়ে

পৃঃ 91: সুধা সাগরের তীরে

পৃঃ 93: প্রধান শিক্ষক।

পৃঃ 96:নিতাই দাদা -১

পৃঃ 98- 105: নিতাই দাদা, ২ - ৪

পৃঃ 106: নিধিরাম সর্দারের আমলাগিরি

পৃঃ 112: বেচারাম ডিম বেচে, কেনারাম কেনে

পৃঃ 119: মিত্রা মাসী । * একটা পাথর আর ছুটি পরে যোগ করা হয়েছে।

দয়াল বন্ধুর ই-বুক (২)

ছবি যুক্ত করা হয়েছে

ছবি সহ ই - বুক (সাফাই)

মাস দুই আগে একটা ই - বুক তৈরীর চেষ্টা করেছিলাম। খুবই প্রাথমিক একটা প্রচেষ্টা ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু অসঙ্গতি ছিল। বন্ধুরা অনেকেই অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছেন। ভ্রাতৃ প্রতীম ডা অরিন্দম , লেখার সাথে ছবি দিতে বলায় বেশ বিপদে পড়ে গেলাম। ছবির তো অভাব নেই। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা দেওয়া যায়, সেই বাছাই করা ব্যাপারটা বেশ কঠিন। আসলে বেড়াতে গিয়ে এখন এত বেশী ছবি আর ভিডিও আনা হয় যে, ইউ টিউব ভিডিও করে সেগুলিকে জমিয়ে রাখতে হচ্ছে।

এই নতুন প্রচেষ্টায় ভ্রমণ কাহিনী বাদে বাকী কিছু লেখা এক জায়গায় করা হল। আমার পরিচিত যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবকটি লেখাই কোন এক সময় পড়েছেন। অনেক লেখার সাথেই, বর্তমানে অর্থাৎ হয়তো আগে লেখার পাঁচ - সাত বছর পরে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। এই লেখাগুলি আপনাদের পরিচিতরা পড়বে এই আশা নিয়েই নতুন করে সাজিয়ে লেখাগুলি প্রকাশ করছি। কিছু কিছু লেখাতে ছবি দেওয়ার মত প্রসঙ্গ নেই। আবার সিঁড়ি নামের লেখাটা সাজাতে গিয়ে এত বেশি ছবি দেওয়ার কথা মনে পড়ল যে বেশ সমস্যায় পড়ে গেলাম। আর, আসল কথাটা হল , চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর সময় কাটানোর একটা গঠনমূলক উপায় হিসেবেই লেখার চেষ্টা করছি। ছাপানো বই কিনে পড়ার মানুষ একেবারেই মুষ্টিমেয়, তাই ওপথে আর যাচ্ছি না। আপনারা আপনাদের মতামত আমাকে ই - মেলে জানালে খুশি হবো। আমার মেল আই ডি dayalbm@gmail.com

ধন্যবাদান্তে, ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার, দমদম, কলকাতা ৭০০০৩০. ২৮.১.২০২৫.

নে ঝোলা, চল ভোলা

খুব অকিঞ্চিৎকর, এমন কি বাজে লোকও অনেক সময় এক আধটা দারুন কথা কি করে যেন বলে ফেলে। আমাদের দপ্তরে একজন অত্যন্ত ফাঁকিবাজ করনীক ছিলেন। কোনদিন কোন কাজ করতে দেখিনি। আমরা যখন কোথাও কোন চক্ষু পরীক্ষা শিবির করতে যেতাম, লোকটা ঠিক সকাল সকাল এসে হাজির হত। গাড়িতে উঠে চলত আমাদের সাথে। শিবিরে গিয়েও ওর তেমন কোন কাজ থাকত না। কিন্তু সব জায়গায় গিয়ে মোড়োলি করে বেড়াত। এমন সব বড় বড় কথা বলে আসত যে পরে আমাদেরই বিপদে পড়তে হত। এরকম চালাকি করে তো সবদিন পার পাওয়া যায় না। ওর ভাঁড়ামী আর মোসাহেবী আমাদের বড় কর্তা বেশ উপভোগ করতেন। ঐ সব করতে গিয়ে একবার এমন পাকিয়ে তুলেছিল যে, বড় কর্তা লোকটিকে আমাদের দপ্তর থেকে তাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর থেকে কয়েক বছর আর তাকে দেখিনি। একদিন শুনলাম চাকরী থেকে অবসর নিয়েছে । আবার একদিন শুনলাম লোকটা মরেই গেছে। ও চাকরী করার সময় এতই অনিয়মিত ছিল যে, কেউ কেউ মজা করে বলত, লোকটা বোধহয় মরে গেছে। তাই এখন যে লোকটা সত্যিই মরে গেছে, মাঝে মাঝে মনে হয়, আদৌ কি মরেছে? তো এই রকম একটা ভাঁড় একবার আমাদের সাথে একটু দূরের এক জেলায় চলল শিবির করতে। বিকেলের ট্রেনে গিয়ে , একরাত থেকে, পরদিন শিবির। এত দীর্ঘ সময় ওরকম একটা ভাঁড়ের সাথে থাকলে নানান রকম বিচিত্র গাল গল্প শোনা যাবে, এ আর আশ্চর্য কি।

ঐ সময় ওর মুখেই শুনেছিলাম যে , একবার নাকি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে ঝামেলা করে মাস খানেকের জন্য বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রচুর নগদ টাকা একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে পুটুলি করে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের দিকেও চলে গেছল। ওর বলা গল্প বলেই, বেশীর ভাগই জল মেশানো বলেই জানতাম। ঐ গল্পের মাঝেই একটা সুন্দর কথা বলেছিল, " নে ঝোলা, চল ভোলা"! কথাটা সে নিশ্চয়ই কোন সাধু সন্তের কাছে শুনেছিল।

এই ঝোলা আর ভোলা কথা দুটিই বিশাল অর্থ বহন করে। ঝোলা বলতে সাধারণ ভাবে বোঝায় ভিক্ষার ঝুলি। একটা গামছা বা ধুতির টুকরোর চার কোণে গিট দিয়ে কাঁধে ঝোলানোর ব্যবস্থা। আমরা ছোট বেলায় গ্রামের দিকে দেখতাম , দু তিনিটি লোক , মাঝে মাঝে এসে হাজির হত। তাদের হাতে কর্তাল আর কাঁধে ঝোলা। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গুরে ভিক্ষা করাই তাদের পেশা । ঐ রকম গামছা বা ধুতির টুকরোর ঝোলা বা ঝুলিকে আমরা ভিক্ষার ঝুলিই বলতাম। পেশাদার ভিক্ষাজিবী ছাড়াও আর কিছু ক্ষেত্রে ঐ ঝুলি অপরিহার্য ছিল। বামুন বাড়ীর ছেলেদের উপনয়ন বা পৈতা অনুষ্ঠানের একটা অংশ ছিল, ভিক্ষা। নেড়া মাথায় , গেরুয়া কাপড় পরে কাঁধে একটা ঝুলি নিয়ে , নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা নিতে হত। আবার পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের ঐ রকম একটা ঝোলা কাঁধে ছবি খুব দেখা যায়। সম্ভবত এই পরিব্রাজকের কাঁধের ঝোলা থেকেই ঐ নে ঝোলা কথাটা এসেছে। কথা হল , এই পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সাথে কি ঘুনাক্ষরেও ঐ রকম " বৌ এর সাথে ঝগড়া করে বাড়ী ছাড়া" ভাঁড়েদের তুলনা করা যায়?

আমারা সন্যাসি বললে , লোটা কম্বল নিয়ে পথে বেরিয়েপড়া বিবাগী লোকগুলিকেই বুঝি ।বেনারস্ , অমরকন্টক, হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থানে যে সব গেরুয়া পোষাকের কিংবা নাঙ্গা সাধু দেখেছি, তাদের কাউকেই দেখে মনে হয়নি যে তারা একশো ভাগ ত্যাগি সন্যাসি। আমার মনে হয়েছে ঐ সব ট্যুরিষ্টদের কাছে হাত পাতা লোকগুলির সিংহভাগই আমদের এই ভাঁড় মশাই এর মত। আবার ঠিক উল্টোটাও দেখছি। চরম ক্ষমতা লোভী, ভোগী রাজনীতিবিদ , গেরুয়া পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্দির ,আশ্রম ,দেবস্থান ,চরম ভোগী নৃশংস লোকেদের আখড়া হয়ে গেল। আমাদের ঝোলার অবস্থাও তাই হয়েছে। যে কেউ একটা ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেই হল। এই ঝোলার কেমন বিবর্তন হয়েছে দিনে দিনে। উনিশশ বাহান্ন সালের দিকে নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন শৈলেন্দ্র নারায়ন ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই। পরিক্রমায় বেরনোর সময় ওনাদের পোশাক পরিচ্ছদের যে নিয়মের কথা শাস্ত্রী মশাই লিখে গেছেন, তাতে একটা ছোট ঝোলার কথাও আছে। কমন্ডলুতে নর্মদার জল, একটা কম্বল ছাড়া ঝোলায় কোন টাকা পয়সা নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য সেই সময়ও কিছু কিছু সাধুর দলের সাথে আজকের ক্যাটারারের মত জিনিস পত্রের বোঝাও চলত। শুদ্ধ পরিক্রমাবাসি কখনও একদিনের খাদ্যও ঝোলায় বয়ে বেড়াতেন না। তেমনি তাঁদের ভিক্ষা দিতে পারলে মন্দিরের পুরোহিত থেকে সাধারণ গৃহস্থ সবাই নিজেদের ধন্য মনে করত।

সাহিত্যিক সমরেশ বসু মহাশয় পর্যটকের যে বৈরাগ্যের কথা বলেছেন, আজ পর্যন্ত একজনও তেমন পর্যটকের কথা কোথাও পড়িনি। সমরেশ বসু মশাই -এর মতে, পর্যটক শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াবেন। দিনান্তে একবার গাছের তলায়, মাটির পাত্রে চাল ফুটিয়ে নেবেন। যাওয়ার সময় ঐ মাটির পাত্র ফেলে যাবেন।

আসলে ঐ রকম প্রায় শুন্য ঝোলা নিয়ে পর্যটন বা তীর্থে যাওয়ার একটা লোকও আজ আর নেই। এখন আমরা ট্যুরিস্ট। সাথে ঝোলা থাকে; একটা নয়, কয়েকটা। সে ঝোলা ঐ রকম গামছা বা কাপড়ে গিঁট দিয়ে তৈরী নয়। নামি দামি কোম্পানির ট্রলি ব্যাগ ট্যাক্সিতে তুলে হাওড়া স্টেশন, সেখানে কুলীর মাথায় চাপিয়ে ট্রেনের রিজার্ভ করা এ সি কামরায় পৌঁছয়। ঝোলা অবশ্য একটা থাকে, সেটা দলের কর্ত্রীর কাছে। সেটাকে হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া হলেও সেটা কিন্তু ঝোলা নয়। সেটাকে এখন বলা হয় বটুয়া বা ইংরেজীতে হ্যান্ডব্যা(নবনিতা দিদিমনি বলেছেন, 'ফুটানিকা ডিব্বা') ওতে থাকে টাকা পয়সা, ডেবিট কার্ডের মত জরুরী জিনিস। শুধু বেড়াতে বেরনোর সময়ই নয়; এ রকম হাত ব্যাগ সারা বছরই মহিলাদের হাতে নিয়ে চলতে দেখা যায়। একটা নয়, কাউকে কাউকে দুটো তিনটে ঝোলা নিয়েও যাচ্ছে দেখা যায়। ছেলেরাও ঝোলা নেয় না বললে ভুল হবে। নানান মাপের, নানান রকমের ঝোলা। সব থেকে বেশী চলছে পিঠের ঝোলা। দুটি হাত খালি থাকে, চলতে ফিরতে বেশ সুবিধা। কিন্তু বাসে ট্রেনে এরকম একটা ঢাউস ঝোলা পিঠে নিয়ে উঠলে অন্য যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এরকম পিঠের ঝোলা ব্যাগ কম বয়সি মেয়েরাও আজকাল খুব ব্যবহার করে।

কয়েক রকমের ঝোলা একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্ন হিসেবেও বেশ প্রচার পেয়েছে। বিভিন্ন রঙের কাপড় জুড়ে তৈরী বাউল ফকিরদের ঝোলা একেবারে ওদের ট্রেড মার্ক। যদিও ওনাদের অনেকেই ওরকম বাউলের ঝোলা কাঁধে আমেরিকার প্লেনে উঠছেন; সেই প্লেনে ওনাদের ট্রলি ব্যাগ এর ব্যবস্থা স্পনসর বাবুরাই করে দেয়। একটা বেশ বাটিক ছাপ দেওয়া , কাপড়ের ঝোলা, মুখে খুব যত্ন করে রাখা অযত্নের দাড়ি, জিন্সের প্যান্টের উপর ঢোলা পাঞ্জাবী, এই হল আধুনিক কবিদের ট্রেড মার্ক করা পোশাক। এ রাজ্যে যখন বিপ্লবীদের শাসন একেবারে মধ্য গগনে, তখন আবার ওই কবিদের পোশাকে ভাগ বসিয়েছিলেন , সমাজ বদলের বিপ্লবীরা। যদিও শান্তিনিকেতনের সাথে ঐ বিপ্লব বা কাপড়ের ঝোলার কোন সম্পর্ক ছিল না, তবুও কি করে যেন ঐ ঝোলার নাম হয়ে যায়, শান্তিনিকেতনি ঝোলা।

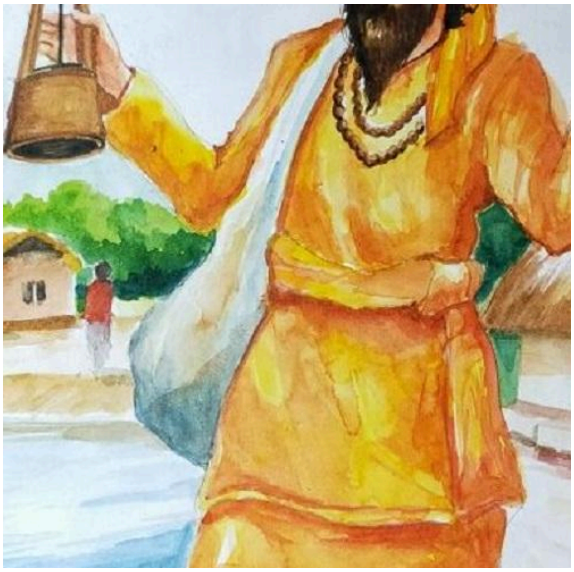
ঝোলা কাঁধে বাউল

আজকাল খুব একটা শোনা না গেলেও , মহিলাদের ঐ হাতের ঝোলার নাম ছিল ভ্যানিটি ব্যাগ। এমন সুচিন্তিত, যুক্তিযুক্ত নাম কেন যে বাতিল হয়ে গেল জানিনা। সত্যিই তো হাতের ঐ ঝোলাটাতে সকল রকম অহংকার ভর্তি করে নিয়েই চলেন সকলে। তা সে বাজারেই যান আর মন্দির আশ্রমেই যান। যে ভোলা বা ভোলানাথের নামে ঝোলা তোলার কথা বলা হয়েছে, তার মত আপন ভোলা , আশুতোষ আর কোন দেবতা নেই। ঐ ভোলানাথ -এর কৃপা লাভের জন্য পার্থিব জীবনের সব কিছু ফেলেই প্রার্থনা করতে হবে। নে ঝোলা না বলে , "ফ্যাল ঝোলা ডাক ভোলা" বললেই ফলদায়ক হবে। সারা জীবন ঐ অহংকার-এর ঝোলা বইতে বইতেই গেল। হাজার তীর্থে ঘুরেও তাই ভোলানাথের দর্শন হয় না।

সিঁড়ি

সিঁড়ি একটা খুবই সাধারন জিনিস। আমরা সকলেই, প্রতিদিনই সিঁড়ি ব্যবহার করছি। সবসময় পায়ের তলায় থাকলেও সিঁড়ির অবদান মাথায় তুলে রাখার মতই। জীবনে যেখানেই হোক আর যখনই হোক, উপরে উঠতে গেলে সিঁড়ি লাগবেই। সিঁড়ির বিকল্প লিফ্ট হলেও, সিঁড়ি কিন্তু রাখতেই হবে। আচ্ছা, এমন বাড়ী কি কেউ দেখেছেন, শুধুই লিফ্ট আছে, সিঁড়ি নেই? আসলে ঐ লিফ্টকেও আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে।

বাড়ী ছাড়াও অনেক জায়গায় সিঁড়ি থাকে। সাধারণত বাড়ীর বারান্দা বা নিচের তলাটাও উঠান বা রাস্তা থেকে একটু উঁচু থাকে; দু এক ধাপ সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয়। আমাদের গ্রামের ওদিকে মাঝে মাঝেই বন্যা হয়েযায়। এজন্য বাড়ীগুলি রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তত দশ বারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভেতরের উঠানে ওঠার জন্যও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। এখন অনেক বিরল হলেও গ্রামের মাটির বাড়ীও দোতলা এমনকি তিন তলাও হয়। মাটিরই সিঁড়ি হয়। অনেক বাড়ীতেই কাঠের সিঁড়িও হয়। কাঠের সিঁড়ি বেশী দেখা যায় পাহাড় অঞ্চলে। এছাড়া জংগলের বাংলো বা রিসোর্টের সিঁড়িগুলিও কাঠের হয়।

পুকুর ঘাটের সিঁড়িও গ্রামে বহুল ব্যবহার হয়। এই সিঁড়ি পাকা বাঁধানো হতে পারে; কিন্তু বেশীরভাগই কাঠের গুঁড়ি বা বড় বড় পাথরের তৈরী। বর্ষায় যখন পুকুর জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায় এসব কাঠের বা পাথরের সিঁড়ি ডুবে থাকে।

আবার যখন একটু একটু করে জল নামতে থাকে, ঘাটের সিঁড়িও একটা করে জেগে ওঠে। এই সিঁড়ির ধাপে বসে, ছিপ দিয়ে পুঁটিমাছ ধরা, আমাদের ছোটবেলায় একটা ভালো খেলা ছিল। এখনও গ্রামের বাড়ী গেলে, একটু সময় পেলেই পুকুরের ঘাটে ছিপ ফেলতে চলে যাই। কৈশোরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এক একবার স্বপ্নের মত দেখতে পাই, একটা ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিপ ফেলছে, চল্লিশ বছর বা তারও আগে।

ঘাটের সিঁড়িতে খেলার দারুন সব সুখ স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের পাকা ঘাটের সাথে। হাসপাতাল অর্থাৎ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠই ছিল আমাদের খেলার মাঠ। মাঠের পাশেই সিমেন্ট বাঁধানো ঘাট। খুব ছোটবেলায় যখন মাঠের খেলায় জায়গা পেতাম না, ঐ পাকা ঘাটের সিঁড়িতে খেলতাম।

লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি একটা একটা করে নেমে গেছে জলে। জল যতোই নামুক, শেষ সিঁড়িটা কখনওই বেরত না। ঐ সিঁড়িতে অনেকে সাবান দিয়ে কাপড় জামা কাচত। আমরা ওখানে ছিপ ফেলে মাছও ধরেছি। পরে অনেক জায়গায় পুরনো রাজবাড়ি বা মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ি বড় দিঘী বা নদীতে নেমে গেছে দেখেছি। আমাদের পাকা ঘাটের সিঁড়ি বোধহয় বারো কি চোদ্দটা ছিল। দিনাজপুরের বাহীন রাজবাড়ির পিছনের ঘাটের গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি নদীতে নেমে গেছে।

ঘাটের সিঁড়ি বললেই মনে আসে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। ঐ ঘাটের সিঁড়িও এক একটা সিনেমা বা উপন্যাসের চরিত্র। মনে আছে, জয়বাবা ফেলুনাথ? আর এক জায়গায় কয়েকশ সিঁড়ি নর্মদা নদীতে নেমেছে, ওংকারেশ্বরে। ঐ সিঁড়িতে বসেই প্রলয় দাসজী কত উপদেশ দিয়েছেন শৈলেনবাবুকে। হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি দেখলাম সিঁড়িতে বসে। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের কাছেও সুন্দর সিঁড়ি নেমেছে গঙ্গায়।

যে কোন তীর্থ বা মন্দিরেই সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। কয়েকমাস আগে ঘুরে এলাম রুদ্রপ্রয়াগ। সঙ্গমের জলের কাছে চলে গেলাম, কয়েকশ সিঁড়ি ভেঙেই। এই সিঁড়ি ভাঙার ভয়েই নামাহল না পাঁচমারীর বিখ্যাত বী ফলসে। আগেরদিন অবশ্য শ খানেক সিঁড়ি ভেঙেই উঠেছিলাম পান্ডব গুহায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে জব্বলপুরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির দেখলাম না। উড়িষ্যার উদয়গীরি খন্ডগীরিও ওঠা হয়নি ঐ সিঁড়ির জন্যই। তবে অজন্তা আর ইলোরায় কয়েকশো সিঁড়ি ভাঙতেও কোন অসুবিধা হয়নি। বেড়াতে গিয়ে সবথেকে খাড়া সিঁড়ি ভাঙলাম দৌলতাবাদ দূর্গে। অবশ্য পাহাড়ের মাথায় একেবারে ফাঁকা একটা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুরীর মন্দিরেও অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। ওপরে যাওয়ার পর আবার বেশ সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পাতালেশ্বর শিব দেখতে হয়।

কলকাতার পাতাল রেলে তো শুধুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা। কয়েকটা জায়গায় চলমান সিঁড়ি আছে বটে, তবে বেশীর ভাগই সিমেন্টের সিঁড়ি। দিল্লি আর হায়দরাবাদের মেট্রোতে চড়তে হলে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠতে হয়।

গাড়ীর সিঁড়ির কথা যখন এসেই গেল, কোন কোন গাড়ীতে সিঁড়ি ছাড়া চলেনা, দেখা যাক। বাসে ট্রামে দরজায় দু তিন ধাপ সিঁড়ি। আগে যখন দোতলা বাস ছিল তখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। এক এক সময় ঐ সিঁড়িতে এমন ভীড় হত যে দম বন্ধ করে দিত। এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠার জন্য দরজায় সিঁড়ি আটকানো থাকে। লোকাল ট্রেনে সব দরজায় সিঁড়ি না থাকলেও আজকাল অনেক দরজার নিচে সিঁড়ি থাকছে। বাসের ছাদে ওঠার জন্য পিছনে সিঁড়ি থাকে। কিছু কিছু লোক প্রচন্ড ভারী বোঝা মাথায় করে ঐ সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে যায়।

লরীর পেছনে একটা শক্ত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে মালপত্র তুলতে দেখেছি। নৌকা বা লঞ্চে ওঠার জন্যও ঐ রকম একটা পাটাতন সিঁড়ি খুব ব্যবহার হয়। চুচুড়ার লঞ্চে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেযেতে হয়। বড় বড় লঞ্চ বা জাহাজের বিভিন্ন তলায় ওঠা নামার জন্য সাধারণত কাঠের সিঁড়ি। জাহাজের মাস্তুল আর কারখানার চিমনির গায়ে লোহার সিঁড়ি তৈরী করা থাকে।

এরোপ্লেনে ওঠার জন্যও সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। তবে কোলকাতার মত বড় বিমান বন্দরে এখন সিঁড়ি ছাড়াও ওঠার ব্যবস্থা আছে। রেল ষ্টেষনে সিঁড়ি থাকেই। মাথার ওপর দিয়ে লাইন পেরনোর জন্য ফ্লাইওভারের সিঁড়ি। আগে সবই কাঠের ছিল; এখন নতুন সব সিমেন্টের হচ্ছে। ছোটবেলায় কাঠের ফ্লাইওভারে উঠতে খুব ভয় পেতাম। সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত। এখন অনেক ষ্টেশনেই সাবওয়ে হচ্ছে। আমি দেখেছি ওভারব্রীজের থেকে সাবওয়ে বেশী সুবিধাজনক লাগে।

গাড়ী তো হল ; ঘোড়ায় চড়ার জন্যও কি সিঁড়ি লাগে? দেখিনি কোথাও। তবে হাতির পিঠে চড়ার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে জলদাপাড়া অভয়ারন্যে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা প্লাটফর্মে পৌছে হাতির পিঠে উঠেছিলাম। কুলিক পক্ষী নিবাসে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠে সিমেন্টের টাওয়ার থেকে পাখি দেখা যায়।

সিঁড়ির রকমফের নিয়ে কটা কথা বলি। সাধারনভাবে পাকা বাড়ীর একতলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার জন্য যে সিমেন্টের সিঁড়ি হয়, সেগুলির অর্ধেক একমুখি নেমে একটু চওড়া জায়গা বা ল্যান্ডিং; তারপর আরেক মুখে বাকিটা ওঠার। অনেক বাড়ীতে একটু গোলকরে ঘুরিয়েও সিমেন্টের সিঁড়ি হয়। নিজের বাড়ী বেশ খরচ করে ডিজাইনার দিয়ে প্লান করে যারা বানায়, তাদের সিঁড়িই বাহারি হয়। ঐ সিনেমা বা সিরিয়ালে যেমন হয়। প্যাচানো লোহার সিঁড়ি দু একটা এখনও দেখা যায়। কলকাতার শহিদ মিনার আর দিল্লির কুতব মিনারের ভেতরে সিমেন্টের প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে শুনেছি, ঢোকা হয়নি কোনদিন।

সিঁড়ি বললে কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে আটকানো ওঠা নামার ব্যবস্থাই বোঝায়। আর সিঁড়ি যদি সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার মত হয় তখন তাকে মই বলে। মই আমরা ছোটবেলায় বাঁশের তৈরীই দেখতাম। এখন কাঠের, লোহার, আলুমিনিয়ামেরও দেখা যায়।

বাস্তবের সিঁড়ি ছাড়াও কয়েকরকম সিঁড়ির কথা শোনাযায়। রাবন রাজা নাকি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন। কবিরাতো স্বপনের সিঁড়ির কথা লিখেই গেছেন। স্কুলের অংকের ক্লাশে সিঁড়িভাঙা অংক আমরা করেছি। আমি অনেকদিন আগে একটি মুষ্টিযোগ শিখেছিলাম ; বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে, চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকুন, একটা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামছেন। একটা একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে দিয়ে নামছেন, সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়বেন।

একটা তলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার সোজা একটা সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট বেশী হয়। মাঝে একটা ল্যান্ডিং থাকলে কষ্ট যেন একটু কম হয়।

চলমান সিঁড়ির মত আর একটা যান্ত্রিক সিঁড়ি হয়, দমকল দপ্তরের হাইড্রোলিক সিঁড়ি। অনেক উঁচুতে দ্রুত ওঠাযায়।

লোহার প্যাচানো সিঁড়ি ছাড়াও সোজা লোহার সিঁড়িও অনেক জায়গায় দেখেছি। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়ি হয়েছে অনেক পরে। আমাদের ছোটবেলায় কয়েকজন জানালা ইত্যাদিতে পা দিয়ে ঐ ছাদে উঠতে পারতো,তখন ওদের বীর ভাবতাম। অমর কন্টকের দুধধারায় পৌছতে শেষে এক জায়গায় লোহার সিঁড়ি হয়েছে এখন; আগে লোকে কি করে পৌছত জানিনা। দমদমে আমার ফ্লাটের লাগোয়া লোহার সিঁড়ি বিখ্যাত। পাড়া থেকে রেল লাইনে ওঠার পঁচিশ তিরিশ ধাপ সিঁড়ির মাঝের আট ধাপ লোহার,তাতেই নাম, লোহার সিঁড়ি।

সিঁড়িই হোক আর মই হোক, ওঠাটাই সহজ, আর সবাই উঠতেই চায়। যে কোন সিঁড়িতে নামার সময়ই বিপদগুলি হয় ; একটু অসাবধান হলেই পড়ে হাড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা। লুডো খেলায় মই আর সাপ দুইই থাকে, তবু কেন সাপ লুডোই বলে জানিনা। বেচারা সাপগুলোর সম্বন্ধে শিশু বয়েস থেকেই বাজে ধারনা তৈরী হয়। আসলে টেনে নামানোর জন্য সাপেদের কোন অবদানই নেই। মানুষই মানুষকে টেনে নামায়। আর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া, সে তো মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

https://www.amazon.in/dp/8188036501/_encoding=UTF8?coliid=IC3KGMXZ3T9OM&colid=35GN1EMW6HCU7&psc=0

সিঁড়ি ২

কিছুদিন ধরে আমার পুরোনো লেখাগুলোকে সাজিয়ে, কিছু ছবি যোগ করে পিডিএফ আকারে একটা ই-বুক তৈরীর কাজ শুরু করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক পুরোনো লেখা আবার পড়ছি। বেশ কিছু ছাপার ভুল (Typo mistake) ঠিক করাও গেল। কয়েকটা লেখাতে এর মধ্যে বেশ কিছু নতুন খবর যোগ করার মত হয়েছে। সিঁড়ি নিয়ে প্রথম লেখাটা শুধুই পিডিএফ পাচ্ছি; তাই নতুন তথ্য আর ছবি যোগ করার জন্য দ্বিতীয় আর একটা অংশ লিখতে হচ্ছে।

আপনারা অনেকেই জানেন, ২০২৪ সালের ৩১ শে মার্চ সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি বেশ কিছু জায়গায় বেড়াতে যেতে পেরেছি। সেই সব জায়গায় অনেক কটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হয়েছে। সেগুলির ছবি দিলেই হবে না; তাদের সম্বন্ধে কিছু কথা লিখতেও হবে।

সবথেকে বেশি সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করতে হল, রাঁচির কাছাকাছি জলপ্রপাতগুলি দেখার জন্য। প্রথম দিনই তিনটি জলপ্রপাত দেখতে দেড় হাজার এর বেশী সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করতে হল। আমাদের প্রতিদিন সকালে হাঁটার অভ্যেস আছে তাই সিঁড়ি ওঠা নামা করতে বেশী কষ্ট হয়নি। হুন্ড্রু জলপ্রপাত দেখতে নেমে আধ ঘন্টার মধ্যে উঠে আসা দেখে আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার বেশ অবাক হয়েছিল। সে ভেবেছিল, এই বয়স্ক মানুষ দুজন বোধহয় নিচে পর্যন্ত নামেইনি। কিন্তু আসল মজা টের পেলাম পরদিন সকালে। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলাম পায়ের গোছে দারুণ ব্যথা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীতে উঠে বাকি তিনটি জলপ্রপাত দেখতে চললাম। সেই পায়ের ব্যথা দিন চারেক থাকল।

সীতা ফলসের সিঁড়ি

রাঁচি বেড়াতে যাওয়ার আগে আমরা দুটি রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে এসেছি। এপ্রিলে কালিম্পং আর দার্জিলিং জেলার কয়েকটা হোমস্টেতে ঘুরে এলাম। পাহাড়ে ঘুরতে গেলে কিছু উঁচু নিচু জায়গায় ওঠা নামা করতেই হয়। কিন্তু এই পাহাড়ী এলাকায় ওঠা নামার জন্য সেরকম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নামতে হয় না। রাস্তাগুলি পাকদন্ডি হয়ে ওঠে নামে। খুব কম জায়গায়ই এই পাকদণ্ডী রাস্তার ঘোরানো পথ সংক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ের গায়ে কিছু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ব্যবস্থা আছে; আমরা সেরকম কিছু সিঁড়িতে উঠেছি।

জুন মাসে গেলাম নৈনিতালের দিকে। ওদিকেও পাহাড়ী এলাকা হলেও সেরকম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নামতে হয়নি। প্রথমে আমরা ছিলাম ভিমতালে। ভিমতাল হ্রদের পাড়ে বেশ কিছুটা উপরে আমাদের হোটেল হলেও, গাড়ী হোটেল পর্যন্ত উঠে গেল। পরদিন সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে কয়েক জায়গায় সিঁড়ি ভাঙ্গলাম। রানিক্ষেতেও সেরকম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মত একটিই জায়গা পেয়েছি। দূর্গা -কালী মন্দিরের চত্বরে ওঠার জন্য একটা ছোট্ট টিলার উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। কৌশানিতে পাহাড়ী এলাকা হলেও একবারই সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। গান্ধী অনাসক্তি আশ্রমে পাকদন্ডী দিয়েই ওঠা যায়। আমি গাড়ী ছাড়াই ড্রাইভারের সাথে হেঁটে ঘুরে আসতে গেলাম। গোটা পঁচিশ -তিরিশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা রাস্তা কম হয়, তাই ঐ জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। বিনসারে কোথাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়নি। আমাদের হোটেলটির সামনেই ধাপে ধাপে পাহাড় নেমে গেছে অনেক নিচে। ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি নেমে গেছে। দুই একজন স্থানীয় লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দেখেছি; আমাদের ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামার কোন দরকার ছিল না। বিনসারের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে ঢুকে পূজা দেওয়া হয়েছে। ঐ মন্দিরে ওঠার জন্য সামান্য গোটা পঞ্চাশেক সিঁড়ি ছিল। পরদিন আলমোড়ার কাসার দেবী মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় আর একটি গোলু দেবতার মন্দিরে উঠেছিলাম, শ'খানেক সিঁড়ি বেয়ে। এখানে কিন্তু যাত্রি প্রায় নেই। কাসার দেবী মন্দিরের কাছে যেতে বড় রাস্তা থেকে একটু পাকদণ্ডি গাড়ীতে উঠে তারপর তিন -চার শ' সিঁড়ি উঠতে হল। দেবীর মন্দির ছাড়িয়ে আবার কিছু সিঁড়ি নেমে আবার পঞ্চাশ ষাট সিঁড়ি উঠতে হয় শিব মন্দির চত্বরে ওঠার জন্য। এই শিব মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বাম দিকে খুবই নগণ্য একটি বোর্ড দেখে বুঝলাম, সিঁড়ি থেকে পাশের দিকে সরে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা অতি নগণ্য পায়ে চলা রাস্তা ধরে যেতে হবে, বাঙালির প্রাণের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ-এর ধ্যান গুহায়। আমরা কিন্তু ঐ গুহা দেখতেই ওখানে গেছলাম। পাহাড়ের উপরে সে সময় প্রায় শ'খানেক লোক থাকলেও আমাদের আগে দুজন আর আমরা দুজন, মোট চারজন যাত্রি ঐ গুহা দেখতে পৌঁছেছিলাম। কথা হচ্ছে সিঁড়ি নিয়ে। আমরা নিচে গাড়ীর কাছে নামার সময় দেখেছি, কিছুটা নামার পর একটা রাস্তা বাম দিকে নেমে গেছে, আমাদের হোটেলের দিকে। বিকেলে আবার ঐ রাস্তা ধরে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিলাম। এবার কিন্তু কয়েক মিনিট শিব মন্দির চত্বরে থেকেই নেমে আসতে হল; কাল বৈশাখীর মত মেঘ করে বৃষ্টি আসছে দেখে। সিঁড়ি দিয়ে বেশ দ্রুত পা চালিয়ে, শেষ একশ মিটার রাস্তা প্রায় দৌড়ে হোটেলে ঢুকে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ার সাথে সাথেই জোরে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী এলাকা হলেও ওদিকে কোথাও একটুও ঠাণ্ডা ছিল না। শুধু এই একটি মাত্র রাত্রে গায়ে কম্বল দিতে হয়েছিল। পরদিনই সকালে আমরা আলমোড়া শহর দেখে নৈনিতালের দিকে রওয়ানা হলাম। আলমোড়া বেশ বড় শহর। শহরে একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক থেকে বেরোতে হয়। বাঙালি এই বাণিজ্য শহরে যায়, স্বামী বিবেকানন্দ-এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত একটি বাড়ী দেখতে। আমাদের ড্রাইভার আবার সেই বাড়িটি কোথায় জানে না। বিবেকানন্দ নামটি শুনেই আমাদের নিয়ে গেল , রামকৃষ্ণ মিশনের রামকৃষ্ণ কুটিরে। রাস্তা থেকে দশ পনের সিঁড়ি নেমে স্বামীজীর বড় স্ট্যাচুর কাছে পৌঁছনো গেল। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয় মিশনের অন্য বাড়িগুলি দেখতে।

আমরা বাজারের মধ্যে একটি বিশেষ বাড়ীতে যেতে চাই বলায় ড্রাইভার আমাদের একটি জায়গায় নামতে বলল। ঐ জায়গা থেকে সরু গলি উঠে গেছে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে। গলির দুই পাশে অসংখ্য দোকানপাট। প্রায় একশ সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাজারের রাস্তায় পৌঁছলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেশ করতে করতে এগিয়ে গেলাম, লালা বদ্রিদাসজির সেই বিখ্যাত বাড়ীর দিকে। এই বাড়ীতে স্বামীজী কয়েকদিন ছিলেন। সেই পবিত্র বাড়িটিতে একটি ছোট্ট নীল রঙের বোর্ড দেখে নিশ্চিত হলাম, ওটিই আমাদের পবিত্র তীর্থস্থানটি।

আলমোড়া বাজারে লালাজীর বাড়ী

বেশ পুরোনো বাড়ী। নীচের তলায় দোকানপাট। ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে না পেয়ে নীচের একটি দোকানে জানতে চাইলাম। ওনারা বললেন, লালাজীর বাড়ীতে আজ কেউ নেই; গতকালই ওনারা বাইরে কোথাও গিয়েছেন। আবারও প্রমাণ পাওয়া গেল, তীর্থ দর্শন সবার ভাগ্যে জোটে না। ঐ বাড়ী থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট এগিয়ে বাম দিকে ফুটপাতের মত একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন। এই জায়গাটা রাস্তা থেকে তিন চার ধাপ সিঁড়ি উপরে। ওখানেও একটু উপরে ছোট্ট একটি নীল রঙের বোর্ড আছে। সেই বিখ্যাত জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলে, ফেরার রাস্তা ধরলাম।

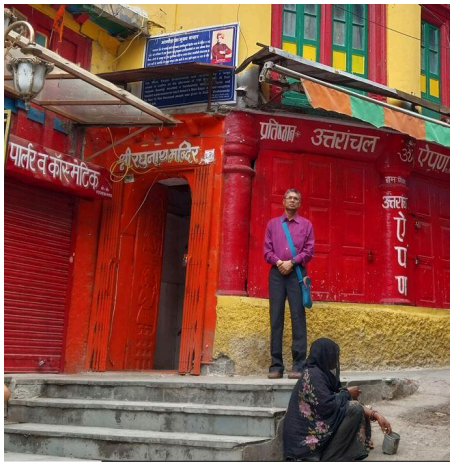

বাজার তখনও ঠিক মত খোলেনি। আবার সেই গলি দিয়ে একশ মত সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল যেখানে আমরা গাড়ী থেকে নেমেছিলাম সেই রাস্তায়। ড্রাইভার বলে দিয়েছিল, আরও কিছুটা নিচের রাস্তায় থাকবে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর কাছে। সরু গলি দিয়ে আরও প্রায় পঁচিশ সিঁড়ি নেমে সেই নিচের রাস্তায় গিয়ে গাড়ী পেলাম। সোজা চললাম নৈনিতালের দিকে। নৈনিতাল শহরে পৌঁছনোর আট- দশ কিমি আগে গাড়ী আটকে দিল। পুলিশ জানাল , নৈনিতালে এত বেশি গাড়ী ঢুকেছে যে, আর গাড়ী ঢোকার জায়গা নেই। বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। পিছন দিকে প্রায় চার পাঁচ কিমি ফিরে এসে, ভাওয়ালি শহরের বাইরে একটা হোটেলে খেয়ে আবার নৈনিতালের দিকে এগিয়ে গেলাম। এবার আর রাস্তা বন্ধ নেই। নৈনিতাল শহরে ঢোকার আগে থেকে প্রচণ্ড জ্যাম জটে গাড়ী শম্বুক গতিতে চলল। লেকের পাড়ে, নীচের রাস্তা দিয়ে গাড়ী এগিয়ে লেকের মাঝামাঝি জায়গায় এলে, আমরা আমাদের দুটি ট্রলী ব্যাগ নিয়ে ঝটপট নেমে গেলাম। ড্রাইভার আগেই বলে দিয়েছিল। ঘুরে উপরের রাস্তায় আসতে হলে, আরও এক ঘন্টা লেগে যেত। নীচের রাস্তা থেকে উপরের রাস্তায় এলাম, ছয় আট ধাপ লোহার সিঁড়ি দিয়ে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে , পাহাড়ী খাড়া রাস্তা দিয়ে অনেকটা উঠে আমাদের হোটেল পেলাম। আমাদের ঘর দেওয়া হলো পাঁচ তলায়। এদের লিফ্ট নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হয়। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকেই লেকের জলে ঘুরে বেড়ানো নৌকা দেখা যায়। যতবারই লেকের পাড়ে ঘুরতে যাচ্ছি, পাঁচ তলা সিঁড়ি বেয়ে নামতে উঠতে হচ্ছে। পরদিন সকালে বেরোলাম, নৈনিতালের আসেপাশের দর্শণীয় স্থানগুলি দেখতে। পাহাড়ী এলাকায় এসবের জন্য ওঠা নামা করতেই হয়। সব জায়গায়ই সিঁড়ি বা পাহাড়ের ধাপ। গাড়ীর জ্যামে সামান্য এক দেড় কিমি যেতেই প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল। এদিকেও একটা জলপ্রপাত দেখতে সব পর্যটক হাজির হয়। এখানেও দেড়শ দুশো সিঁড়ি। কিন্তু অন্য সব জলপ্রপাতের ঠিক উল্টো। এখানে আগে রাস্তা থেকে উপরে উঠতে হয়, পরে রাস্তার কাছে নেমে আসা।

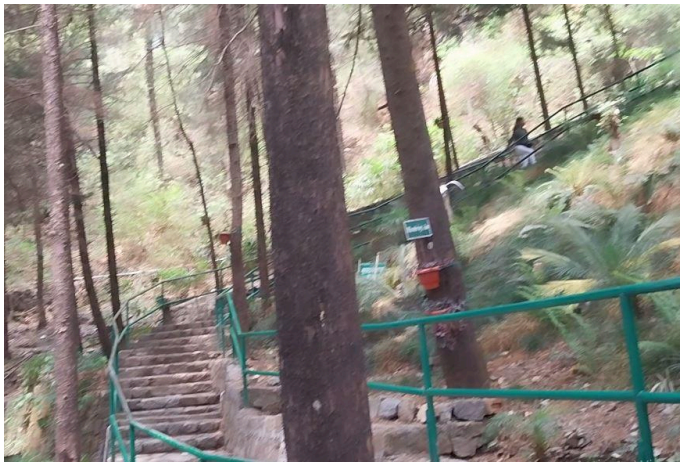
জলপ্রপাত দেখতে ওঠার সিঁড়ি

নৈনিতাল বোটানিক্যাল গার্ডেনেও পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠতে হয়। অনেক সিঁড়ি। জ্যাম জটে এত দেরী হল যে আমরা অন্য দুই এক জায়গায় না ঢুকেই হোটেলে ফিরে এলাম। লেকে বোটিং এর জন্যও প্রায় কুড়িটি সিঁড়ি নেমে যেতে হয় রাস্তা থেকে।

রাঁচির জলপ্রপাত দেখতে কয়েক হাজার সিঁড়ি ওঠা নামা করে আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে, শ্রীনগরের শঙ্করাচার্যের মন্দিরে উঠতে হয় প্রায় শ'চারেক সিঁড়ি বেয়ে। সুন্দর পাথর বাঁধানো সিঁড়ি হলেও সিঁড়িগুলি বেশ উচু উঁচু। প্রায় সবাই উপরে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। আমরাও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম। ওপরের চত্বর থেকেও প্রায় পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে শিব লিঙ্গের কাছে যেতে হল। শ্রীনগরের বিখ্যাত বাগানগুলি সবই পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে। এক এক ধাপে দশ বারো ধাপ করে সিঁড়ি।

শঙ্করাচার্যের মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি

আপনারা আমার ভ্রমণের লেখাগুলি যদি পড়েছেন, তাহলে জানেন যে, নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এক রাত্রের জন্য সবুজ দ্বীপে ঘুরে এলাম। ওখনকার সব বাড়িগুলি, আপিস, কটেজ, রেস্টুরেন্ট সবই মাঠের থেকে দশ ফুট মত উপরে, থামের উপরে । সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। এছাড়া ওখানে একটা চার পাঁচ তলা বাড়ির মত উচু ওয়াচ টাওয়ার আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল, সেটাই দস্তুর। এরকম ওয়াচ টাওয়ারে উঠেছি, রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষী নিবাসে আর জয়ন্তীর জঙ্গলে সাফারী করতে গিয়ে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের ভেতরেও কয়েকটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। এগুলি তিন তলার মত উঁচু হবে। যাত্রীরা হৈ হৈ করে উপরে উঠে মিনিট পাঁচেক থেকে নেমে আসে। ওখানকার কর্মচারীদের কাছে শুনেছি, বিদেশী পর্যটকেরা ঐ টাওয়ারে উঠে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। তারা বাঘ দেখতেও পায়।

কুলিকের টাওয়ারে (১৯৯৪)

সবুজ দ্বীপের কটেজ

ইন্দোরের দিকে বেড়াতে গিয়েও অনেক জায়গায়ই সিঁড়ি পেয়েছি। এই দিকের বেড়ানোটিকে আমি ‘ শৈব তীর্থে ভ্রমণ ‘ বলেছি। বেশ কয়েকটি শিব মন্দিরে ঢুকে দেখে এলাম। মন্দিরগুলিতে কিছু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতেই হয়। প্রথম অংশে বিশেষ করে উল্লেখ করেছি ওমকারেশ্বর মন্দিরের থেকে নর্মদা নদীর দিকে নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়ির কথা। ওখানে গিয়ে দেখলাম, সেরকম উল্লেখ যোগ্য কোন সিঁড়ি নেই। মন্দির থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত যেতে কিছু পাথুরে ধাপ আছে; আমরা ওখানে নামার চেষ্টা করিনি।

ওমকারেশ্বর মন্দিরের নিচে নর্মদা

উল্টো দিকের অমলেশ্বর মন্দিরের চত্বরে ওঠার জন্য নর্মদা নদী থেকে একশ মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল। দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে আমরা বাজারের রাস্তা দিয়ে অমলেশ্বর মন্দিরে গেছলাম।

Activate Windows
অমলেশ্বর মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি

এরপর ব্রীজ পেরিয়ে দ্বীপ পরিক্রমার রাস্তা ধরেছিলাম। ব্রীজ থেকে সামান্য দশ পনের সিঁড়ি নেমে, পাথর বাঁধানো পরিক্রমার রাস্তা। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সেরকম সিঁড়ি নেই। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গমে পৌঁছতে, পরিক্রমার রাস্তা থেকে কুড়ি পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। দ্বীপের উত্তর দিক দিয়ে যে পরিক্রমার রাস্তা চলেছে, সেই পথে অনেক জায়গায়ই সিঁড়ি আছে; কোথাও দশ ধাপ, কোথাও একশ ধাপ।

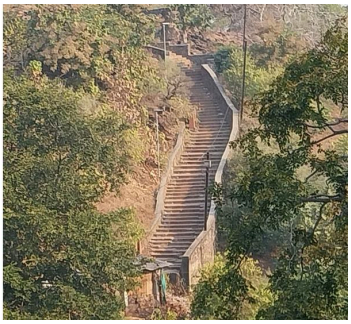
পরিক্রমা পথের সিঁড়ি

নর্মদার বাঁধানো ঘাট আর প্রশস্ত সিঁড়ি আছে মহেশ্বর-এ। মান্ডু দুর্গের জাহাজ মহলের উপরে উঠতে একটি খাড়া সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ ধাপ সিঁড়ি।

মহেশ্বরে নর্মদা ঘাট

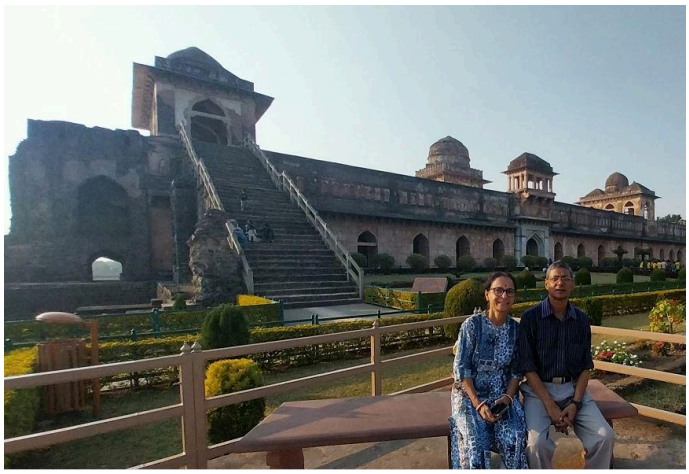
আমাদের পিছনে জাহাজ মহল

ফেরার পথে আমরা প্রয়াগ সঙ্গমের কুম্ভ মেলার প্রস্তুতি দেখে এলাম; নৌকা করে সঙ্গমে গিয়ে একটা ডুবও দিয়েছে। প্রয়াগ রাজ শহরে গোটা দুই তিন মন্দির - আশ্রম দেখলেও সেরকম সিঁড়ি কোথাও পাইনি। সঙ্গমে যাওয়ার নৌকা একটা চড়ায় নিয়ে যায়। ঐ চড়ায় পান্ডাদের মাচা বানিয়ে

শহিদ আজাদের পায়ের কাছে সিঁড়িতে আমি

প্রয়াগের হনুমান মন্দিরের সিঁড়ি

রেখেছে; নৌকা সোজা গিয়ে সেই মাচায় তোলে। এসব মেলা ইত্যাদিতে সব জায়গায়ই কমিশনের ব্যাপার থাকে, বোঝাই যায়। ঐ মাচা থেকে জলে নামার জন্য তিন চার ধাপ কাঠের সিঁড়ি করা ছিল। ঐটুকু না করলে, তীর্থ যাত্রীদের কাছে টাকা নেবে কি করে!

সঙ্গমের মাচায় পান্ডা

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দুদিনের জন্য মেদিনীপুরের গ্রামে ঘুরে এলাম। বন্ধুবর যোগেশ এর বাড়ীর ছাদে ওঠার জন্য লোহার সিঁড়ি করেছে। এই " লোহার সিঁড়ি" শব্দ বন্ধে দমদমে একটি নির্দিষ্ট জয়গাকেই বোঝায়; সে কথা পরে বলছি। আমার গ্রামের বাড়ীর দোতলায় উঠে স্নান করতে হল, গরম জলের ব্যবস্থা দোতলায় বলেই। কিন্তু আমাদের বৌমা মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি গুলিকে এমন ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে যে, নামার সময় পা টিপে টিপে নামতে হল। ভেজা পায়ে নামতে হলে একটু অসাবধান হলেই পতন নিশ্চিত। নিজের বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চলল আমার বন্ধু ডাক্তার পাঠক। একজন মানুষ তাঁর নিজের বাড়ীর দোতলায় উঠে যাচ্ছে, এটা আবার খবর কেন!!!? আসলে ওকে বছর সাত-আট আগে

এতই জুবুথুবু দেখেছিলাম যে, পয়ষট্টি বছর বয়সে নিজেই টকটক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছে, এটা দেখেই মন খুশিতে ভরে গেল। অবশ্য গতকালই আমার প্রতিবেশী , অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ঘোষবাবুকে ছাদে উঠে যেতে দেখলাম, সিঁড়ি দিয়ে। আশির উপর বয়স। দুটি হাঁটুই পাল্টানো হয়েছে বছর দেড়েক হল। ওনাদের দেখলে মনে বল পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলের গ্রামে আছে বিখ্যাত তালন্দমাতা শীতলা মন্দির। রাস্তা থেকে গোটা তিনেক গোল গোল সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চাথালে উঠতে হয়। ছোট বেলায় ঐ চাথালে ওঠার সাহস হত না। এবার দেখলাম, আমার ভাগ্নে ভাগ্নী চাতালে তো উঠলোই , একেবারে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে মাকে প্রণাম করলো।

হ্যাঁ, দমদমের লোহার সিঁড়ি। আমি এখন যে আবাসনে থাকি তার পাশ দিয়েই একটা সিঁড়ি নেমে গেছে; রেল লাইন থেকে পাড়ার মধ্যে যাওয়ার জন্য। ওর বেশীর ভাগই সিমেন্টের। মাঝের গোটা পাঁচ ছয় সিঁড়ি লোহার। কি করে যেন ঐ জন্যই এই জায়গাটা " লোহার সিঁড়ি" নামে বিখ্যাত হয়ে গেছে। দমদমের পঁচানব্বই শতাংশ লোককে জিজ্ঞেশ করলে, এক বারেই বলে দেবে, " লোহার সিঁড়ি" কোথায়। একবার আসবেন নাকি দেখতে !!!?

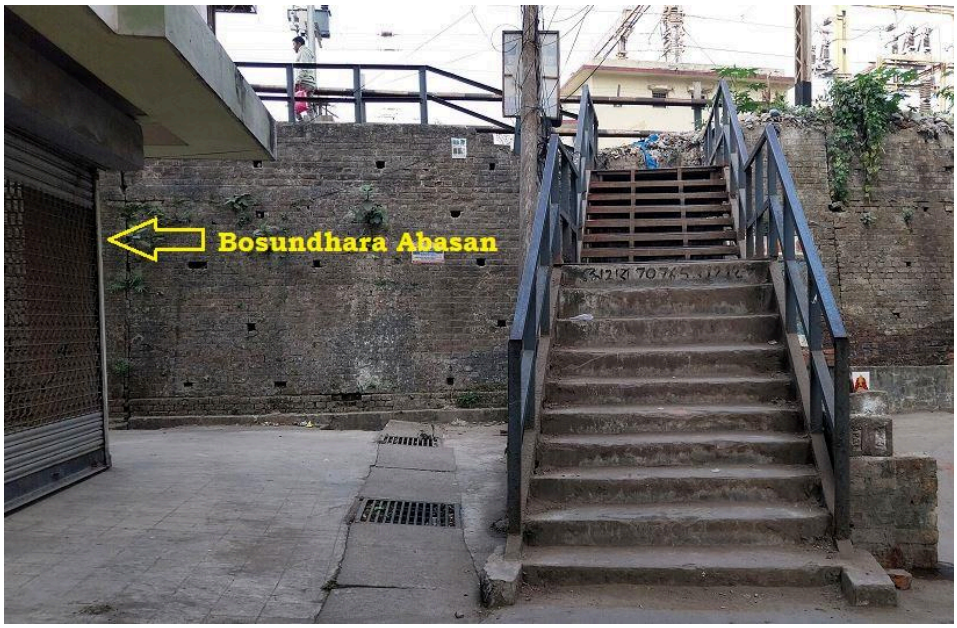

দমদমের লোহার সিঁড়ি

অকিঞ্চিৎকর একটা ফল

একটা অতি সাধারন গাছ ; বলা ভাল, গাছটির অকিঞ্চিৎকর কটা ফল কেমন করে আমার চোখ খুলে দিল ; আজ সেই গল্পই শোনাই। কদিন থেকেই সকালে হাঁটতে বেরিয়ে , দমদমের পাড়ার ভেতরের রাস্তায় , একটা গাছের তলায় বেশ কয়েকটা ফল পড়ে থাকতে দেখছিলাম। ফলগুলি একেবারেই অবহেলায় পড়ে থাকছে; গাড়ীর চাকায় , পায়ের তলায় থেঁতলে যাচ্ছে। একদিন গাছটার দিকে মুখ তুলে দেখলাম, প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু, সবুজ পাতায় ভর্তি। গাছে থোকায় থোকায় হলদে সবুজ ফল ধরে আছে। ঐ ফলই গাছের তলায় ঝরে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতেই ফলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিন দুই আগে; কেমন যেন চেনা চেনা লাগল । মনে পড়ল, দু' হাজার তিন সালে , মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে, এরকমই ফল খেয়েছি। পাহাড়ের উপর, দুজন আদিবাসি মহিলা বসে বিক্রী করছিল । বোধহয় পাঁচ টাকায় দশ পনেরোটা ফল , পাতার ঠোঙায় করে দিয়েছিল । নুনও একটু দিয়েছিল। আমাদের গ্রামের টক কুলের মত কিছুটা খেতে। মাঝে আঠারো বছরে আর কোথাও ঐ ফল দেখিনি।

রামরাজাতলা রেল ষ্টেশনের এলাকায় একটা বড় গাছে , অনেকটা ঐ রকম ফল প্রচুর ফলে আছে দেখেছিলাম, ট্রেনে বসে। নেমে, কাছের থেকে দেখার মত সুযোগ সময় হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, ওটা অন্য কোন গাছ ছিল। ঐ গাছটার পাতা সেগুন বা শাল পাতার মত দেখতে। আর , গতকাল সকালে যে গাছের ফল কুড়িয়ে এনে জানতে পারলাম, এই সেই এলিফ্যান্টার ফল, সেই গাছটার পাতা খুব ছোট ছোট, শিরীষ পাতার মত দেখতে।

দমদমের যে ফলের কথা বলছি, সেগুলি অনেকটাই হলুদ। বুঝতে পারছি, এগুলি পাকা ফল। মুম্বইয়ে, অক্টোবর মাসে সেই যে ফল খেয়েছিলাম, সেগুলি একটু ছোট আর অনেকটা সবুজ রং ছিল। ওগুলি বোধহয় তখনও কাঁচা ছিল। দমদমের ফলগুলি যেভাবে অবহেলায় পড়ে আছে, তাতে বোঝাই যায় যে, কেউ ঐ গাছের ফল কুড়িয়ে খায় না। আমিও নিশ্চিত না হয়ে মুখে দিইনি। ফলগুলি সম্বন্ধে জানতে চেয়ে, তিনটি ফলের ছবি তুলে, ফেসবুকে আর হোয়াটস অ্যাপ -এর দু'শ ছাপান্ন জনকে পাঠালাম। কয়েক মিনিটেই কয়েকটা উত্তর পেলাম। সারাদিন প্রায় দশ রকম নাম জানলাম।

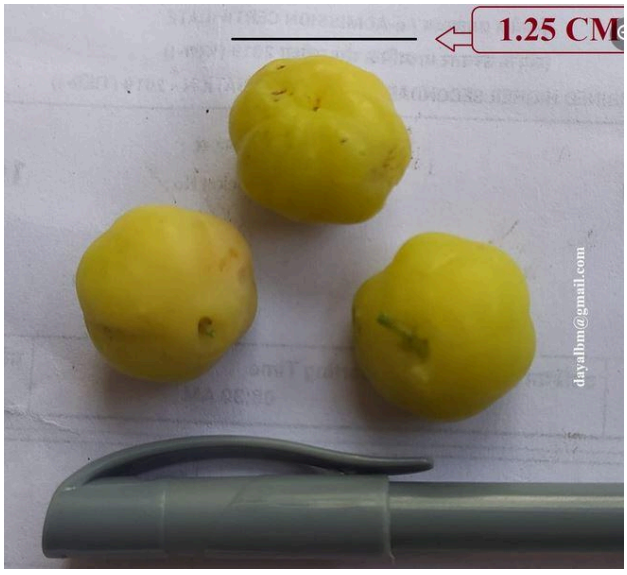

প্রথম জানালেন, আমার কলেজের দাদা। উনি শুধু লিখলেন, "হরবরোই"। বাংলাদেশে কুলকে বরোই বলে, জানতাম। কিন্তু এই নামটা আগে শুনিনি। বন্ধুবর ডাক্তার শীল জানালেন, নামটা মনে নেই, কিন্তু মাদুরাইতে থাকার সময় খেয়েছেন, অনেকটা আমলকীর মত টক। বুঝলাম, নাম যাই হোক, ফলটা খাওয়া যায়। আর, এটাই আমার সেই এলিফ্যান্টা দ্বীপের ফল। এরপর সারাদিনে গোটা পশ্চিম বাংলা থেকেই নানা জনে জানিয়েছেন, এই ফলের গাছ দেখেছেন , বা ফল খেয়েছেন। অনেকেই জানালেন, এ ফল তারা অনেকবার খেয়েছেন। কারো কারো বাড়িতে দু চার বছর আগেও গাছ ছিল। পুর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে তিন- চারজন প্রায় একই রকম নাম জানালেন। শীলাকুল বা সিল্লাকুল, শীল আমড়াও জানালেন একজন। এছাড়া "নোর" নামটাও কয়েকজন জানালেন। কেউ কেউ লিখলেন , " রয়াল" ফল ; নোরাইলও বলেছেন কেউ।

জানতে চাওয়ার মিনিট কুড়ির মধ্যে , পুর্ব মেদিনীপুরের পটনায়কবাবু একটা ছবি পাঠালেন। এই ফলের নাম সেখানে লেখা " অড়বড়ই"। সম্ভবত ওটা কোন আয়ুর্বেদের বই-এর পাতা থেকে নেওয়া ছবি। অড়বড়ই বা হরবরোই যে একই ফলের অঞ্চল ভেদে ভিন্ন উচ্চারণ, বোঝাই যায়। পটনায়াকবাবুর পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, ঐ ফলের অনেক খাদ্য গুন আছে। প্রোটিন, ভিটামিন, নানান রকমের মিনারেল ইত্যাদির তালিকা দেখলাম। ইংরেজী নামটাও জানা গেল , " Star Gooseberry"! অর্থাৎ এও একরকম আমলকী। dayalbm@gmail.com

খাদ্য গুন যাই থাক, মুখ রোচক টোপা কুলের মতোও যে এ ফল আমাদের দেশী ফলের তালিকায় নেই, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমার বন্ধু তালিকা বিশাল। যতো জন এ ফলটা খেয়েছেন বা অন্তত নাম জানেন জানিয়েছেন, তার সমান বা বেশী লোক জানিয়েছেন, এটা কি ফল জানেন না কিংবা ভুল করে একে আমলকী ভেবেছেন। একটা অকিঞ্চিৎকর ফল নিয়ে আমার এত কিছু ভাবার কি হল? একটু বেশীতই মাতামাতি করছি না কি? আসলে এই ফলটা নিয়ে মাতামাতি করারও কিছুই নেই। আমি এই ফলটাকে দমদমে পাওয়ার পর আমার মনে কিছু ভাবনা এসেছে।

গতকালই বুঝেছি, এ ফলটা এ বাংলার গ্রামে খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। অন্তত কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু দেখুন, আমি প্রথম এ ফলটা দেখি বা মুখে দিই আমার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। তাও আবার সুদূর মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা দ্বীপের মত জায়গায়। আমাদের গ্রামের ওদিকে অনেক গ্রাম্য বা বুনো ফল পাওয়া যায়; আমি খেয়েছি। এই শীলাকুল বাদ দিয়ও অন্তত পাঁচ- ছয় রকমের কুল আমাদের গ্রামের ওদিকে পাওয়া যায়। তাছাড়া 'কুরুক জাম', বড়ফল, পাকা গাব এমন খুব অপ্রচলিত ফলও আমি আমাদের গ্রামের ওদিকে পেয়েছি। মেদিনীপুরের গ্রামের আদারে বাদাড়ে যে সব ফল পাওয়া যায় সবই আমি চিনি আর খেয়েছি। এ বাংলার গ্রামে গঞ্জে এখনও অনেক ঘুরে বেড়াই। আমার ধারনা ছিল , গাছপালা আমি খুব ভালো চিনি। কিন্তু দমদমের এই গাছটার তলা দিয়ে কয়েকশ বার যাতায়াত করেও গত সাত বছর খেয়াল করিনি যে, ওটা আমার কাছে অচেনা একটা গাছ। গত সাত বছরও নিশ্চয়ই বৈশাখ মাসে ঐ গাছের তলায় এমনই হলুদ ফল পড়ে থেকেছে। এতদিন পরে আমার চোখে পড়ল! আমার ক্লাশে একটা চিনা বাকধারা আমি খুব বলি। " মন যা জানেনা, চোখ তা দেখে না।" এমন কত কি আছে, যা আমরা দেখেও দেখি না।

ডাক্তারী পড়ার সময় আমাদের কতগুলি সাধারণ জিনিস পড়ানো হয়। প্রথমে মানুষের শরীরের গঠন ও নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ। তারপর নানান রোগের জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে কি কি পরিবর্তন হয় সেসব। নানান অসুখের উপসর্গ আর রোগ লক্ষন থেকে কি করে রোগ নির্ণয় করা যায়; এগুলি সকলকেই পড়ানো হয়। তবুও এক এক জন ডাক্তার এক এক রকম হয় কেন? প্রত্যেকটি মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আলাদা আলাদা। গোড়ার শিক্ষার সাথে এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ব্যাবহার করে ডাক্তারী করতে হয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আমার এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব ভাল। কিন্তু এই সামান্য একটা ফল আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আমার চোখ কানও তেমন খোলা নয়।

21.4.2021 তারিকে লেখা।

এক ডাকাতির গল্প

আমার বন্ধু সেই ভোলাদার কথা বলতে গেলে একটা বই লেখা যায়। আগে সংক্ষেপে ওনার কথা কিছু লিখেছি। ওনার সেই পঞ্চায়েতির গল্প। সেই রকম এক মোষ তাড়ানোর কাজে গেছলাম, আমরা দু'জন;ওনার স্কুটার নিয়ে। বিকেলের দিকে ফিরছিলাম, কেশপুরের দিক থেকে মেদিনীপুর শহরে। মাঝে একটা বাজার মত আছে, জামতলা। ওখান থেকে গ্রামের ভেতরে একটা মোরাম রাস্তা চলে গেছে। মাইল খানেক ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। কিছুটা আগে ওনাকে বললাম, এই গ্রামের ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। শুনে কেমন যেন একটু অবাক হলেন। আসলে সেই গ্রামের একটা বদনাম আছে। আমি হালকা আগ্রহ প্রকাশ করতেই উনি সেই মোরাম রাস্তায় স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়লেন। সরাসরি স্কুটার নিয়ে দিদির বাড়ী যেতে হলে একটু ঘুরে যেতে হয়। আমরা খেলার মাঠে স্কুটার রেখে, মাঠের আল ধরে ঢুকলাম। আমার জামাইবাবু , দিদি,ভাগ্নে এখন আর কেউ নেই। ভাগ্নের স্ত্রী এখনও সেই বাড়ী আগলে পড়ে আছে। আজ থেকে তিরিশ বত্রিশ বছর আগে, তখন ওরা সবাই ছিল। জামাইবাবু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হলেও একটু সোজা সোজা মানুষ ছিলেন। আমরা যখন পৌঁছলাম, জামাইবাবু উঠানে মাটি নিয়ে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা একেবারেই ধূমকেতুর মতো হাজির হওয়ায় , হত চকিত হয়ে গেলেন। হাতে পায়ে কাদা মাটি মাখা। বিস্ময়ে, খুশীতে হাউ মাউ করে কি যেন বলেছিলেন। দিদি বেরিয়ে এসে মেদিনীপুরের ভোলা রায়কে দেখে চমকে গেলেন। দুটি মোড়া বা ঐরকম কিছুতে বসতে বললেন। আমরা আধ ঘন্টা মতো থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার পথে ভোলাদা বার দশেক বোধহয় বললেন, এমন বিপজ্জনক জায়গায়, মেয়েগুলোকে নিয়ে ওরা আছেন কি করে? শহরে ফিরে আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

আমার ভোলাদা

মাসখানেক পর একদিন সকালে আমি চেম্বারে বসে ছিলাম; বড় ভাগ্নী এসে ঢুকল। কোন রকমে বলল, কাল রাতে ডাকাত দল এসে বাবাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। আমি কিছু সময় কোন কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, কিছু ভাবতেই পারলাম না। ঐ হাড় জিরজিরে লোকটাকে ডাকাতে মারার পরও বেঁচে আছে, সেটাই ভাবতে পারছিলাম না। কোন রকমে বললাম, ভোলাদার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখত আছেন কি না; আমি আসছি। পাঁচ মিনিট পর গিয়ে শুনলাম, দাদা নার্সিং হোমে গেছেন। গেলাম সেখানে। উনি বললেন, আমি তো এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ভাগ্নীকে কোতোয়ালি থানায় পাঠিয়েছি, মেজ বাবুর সাথে কথা হয়েছে। উনি দেখছেন। একটু পরে

খবর পেলাম, পুলিশ গাড়ি নিয়ে দিদির বাড়ীর গ্রামে চলে গেছে। এসব কথা যে সময়ের , সে সময় মোবাইল ফোন ছিল না। পরে জেনেছি, মেজবাবু সাথে সাথেই ভাগ্নীকে থানার গাড়ীতে নিয়ে ওদের বাড়ী চলে যান। জামাইবাবুকে তুলে এনে হাসপতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মেজোবাবু ওদের বলেন, ঐ গ্রামের সব ডাকাতকে আমরা জানি, ভয় নেই। পরের দিন দুই, রাত্রে গিয় জন সাত আট ডাকাতকে ধরে আনেন। পরে দিদির কাছে শুনেছি , সবকটা ডাকাতকে মেরে হাতগুলি প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। ডাকাতরা গ্রামে ফিরে বলছে, এদের কোন আত্মীয় একটা বড় নেতা। পুলিশ ওদের পেটানোর সময় বার বার বলেছে, তোরা ভোলাবাবুর জামাইবাবুকে মেরেছিস, তোদের সবকটার হাত ভেঙ্গে দেব। সেই ডাকাতি তো এভাবে সমাধান হল। কিন্তু তারপর যা হয়েছে, সেটা রূপকথার গল্পের মত।

সেই প্রথম দিন ভোলাদা ওদের দেখেই যেমন ভয় পেয়েছিলেন, থানার মেজবাবুও মেয়েগুলিকে দেখে ওদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। উনিই বড় ভাগ্নীকে একদিন বললেন, পুলিশে চাকরী করবি? ভাগ্নী মাধ্যমিক পাশ করেছিল। কিন্তু কোনোদিন খেলার মাঠে নেমেছে বলে শুনিনি। মেজবাবু ওকে বলেছিলেন, মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ করে দেখাতে পারলে চাকরী পেয়ে যাবি। কদিন মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ প্র্যাকটিস করা শুরু করলো। এ কিন্তু আজকের সিভিক পুলিশ নয়; একেবারে কনস্টেবল এর চাকরী। ঐ মেজবাবুই বড় কর্তাদের ধরে ওর চাকরিটা করে দিলেন। আল,ভোলা জামাইবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি। ছোট ভাগ্নী খেলাধুলায় চৌকস ছিল। সেও একদিন চাকরী পেয়ে গেল। এই নিয়ে দুই বোন মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে। বড় বলে আমি সাহেবদের ধরে তোর চাকরী করে দিয়েছি। ছোট বলে, আমি মাঠে নেমে সবার থেকে ভালো দৌড় ঝাঁপ করে চাকরী পেয়েছি। যেভাবেই হোক, দুই মেয়ের চাকরী দেখেই দিদি জামাইবাবু নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করেছেন। সব কিছুর জন্যে সেই ভোলামামা। এমন একটা মামা কজনের ভাগ্যে জোটে! ১১.১০.২৪.

জামাইবাবু

গীতার ২য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক

এই একটি শ্লোকের কয়েক কোটি বার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। এবং এটা করা হয়েছে মধ্য যুগের শোষণ এর হাতিয়ার হিসেবে। আপনি " মা ফলেসু কদাচন" এই টুকু বলে যে কোন শিক্ষিত (?) মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটা জানেন ..... এটুকু বলতে না বলতেই উত্তর পেয়ে যাবেন, " ঐ তো ফলের আশা করিয়ো না!"
কিন্তু ঐ শ্লোকটি পুরোটাই বলতে পারবেন এমন লোক লাখে একটাও পাওয়া যাবে না। @(দয়াল) এমনকি শ্লোক টি র প্রথম শব্দটিও লাখে একজন জানেন না। " কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।" এই হল শ্লোকটির প্রথম লাইন। ঐ প্রথম যুক্ত শব্দটি ভাঙ্গলে হয়, কর্মনি + এব+ অধিকার+ স্তে। এখানে অধিকার এর কথা বলা হয়েছে। গোটা শ্লোকে কোন শব্দ নেই যার মানে হয় " আশা করা!"
তোমাকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ফল দেওয়ার অধিকার নয়। একটা সামান্য উদাহরণ বলি। বোর্ডের বা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় যে ছেলে প্রথম হবে, বা ফার্স্ট ক্লাশ ফাস্ট হবে, সে যদি ভাবে, " আমার খাতা আবার কে মূল্যায়ন করবে, আমি নিজেই ১০০ বসিয়ে দিয়ে কাজটা সেরে রাখি!" কেমন হবে ব্যাপারটা? ওকে খাতায় উত্তর লেখার অধিকার দেওয়া হয়েছে, নম্বর দেবার নয়। নম্বর বসানোর অধিকার দেওয়া আছে কোন উচ্চতর যোগ্যতার মানুষকে।
যে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবে, সে তো ফলের আশা করবেই। (২৫.১২.২০২৩)

রাজ কর্মচারি

ঠিক দুই মাস হল সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়েছি। এর মধ্যে বহু মানুষ জানতে চেয়েছেন, কেমন আছি বা কেমন লাগছে। কোন আশ্রমে বা মিশনে যোগ দিয়ে, দু'মাসেই কি বলা যায়, কেমন আছেন? দু'মাসেই কি আধ্যাত্বিক উপলদ্ধি হয়ে যায়? একটা দীর্ঘ দিনের অভ্যাস থেকে নতুন জীবন ধারায় পৌঁছে সেটা কেমন লাগছে, বুঝতে একটু সময় লাগবেই।

আজ সকাল থেকেই বেশ মেঘলা, বর্ষা বাদলার দিন। আমার জানালার বাইরে দেখতে পাচ্ছি, কতো লোক কাজে যাচ্ছেন। সবাই সরকারী চাকরী করতে যাচ্ছেন তা তো নয়। বেসরকারি চাকরী, মিস্ত্রী, কাজের মাসি, আয়া, দোকানদার, কতো কি পেশা। আমার কিন্তু মনে হল গোপাল ভাঁড়ের একটি গল্প। এক বর্ষা বাদলার রাতে গোপাল রাজবাড়ি থেকে বাড়ী ফিরছিল। রাস্তায় একটু জল জমেছে, জোরে বৃষ্টি নামার জন্য, গোপাল এক সাধারণ মানুষের কুটিরের চালের তলায় ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গোপালের পায়ের ছপ ছপ শব্দ শুনে কুটিরের ভেতরের মহিলা বললেন, একটা কুকুর না শেয়াল আমাদের ছাঁচে এসে দাঁড়াল। ঘরের লোকটি বলল, আরে না, নিশ্চয়ই রাজ কর্মচারি; ওরা ছাড়া এই দুর্যোগে কুকুর শেয়াল কেউ বেরোয় না। সত্যিই কি আমাদের সেরকম দুরবস্থা ছিল? পিছন ফিয়ে তাকালে সেরকম কিছু দিনের কথা মনে পড়ে বৈকি। প্রথমে বর্ষার কথাই বলি।

কয়েক বছর আগে এক বর্ষার সকালে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস স্টেশনে নেমে সাত আট মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাই। ছাতা ছিল, তাই একটু একটু বৃষ্টি পড়লেও হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু মাঝ পথে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামল। আমি একটি বাড়ির শেডের নিচে দাঁড়িয়ে গেলাম। ক্রমশ বাড়ছে বৃষ্টি। সামনের রাস্তা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে আমার সহকর্মী এক লেডি ডাক্তার হাসপাতালের দিকে চলেছেন। ছাতা আছে, কিন্তু একেবারে কাক ভেজা যাকে বলে। বুঝলাম, আমার পরের কোন ট্রেনে এসে নেমেছেন, ছাতা খোলার আগেই ভিজে গেছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে না ভিজে সোজা হাঁটা দিয়েছেন, হাসপাতালে পৌঁছে, অপারেশন থিয়েটারের পোশাক পরে নিতে পারবেন। প্রায় তিরিশ বছর এর চাকরী জীবনে অসংখ্য বার এমন কাক ভেজা হয়ে কাজে যেতে হয়েছে, বা কাজ থেকে ফিরেছি। আর কুকুর শেয়াল বেরোতে পারেনি এমন দিনে দুবার, রাজ কর্মচারি হয়ে পথে নামতে হয়েছিল। আম্পানের দিন সকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কোভিডে লক ডাউন চলছে। নিজেই গাড়ী চালিয়ে গেছলাম। দুপুরে আমার পরে যে ভাইয়ের ডিউটি ছিল সে ঝড়ের ভয়ে আগেই এসে গেছে। খবর ছিল দুপুর আড়াইটার পর ঝড় বাড়বে। আমি দুটো নাগাদ গাড়ী চালিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। শহরের ভেতর দিয়ে আসতে তখন মিনিট কুড়ি লাগে, রাস্তা ফাঁকা। সেদিন তো ঝড়ের জন্য আরও ফাঁকা। শিয়ালদা আসতে আসতেই বৃষ্টি প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন দাঁড়িয়ে গেলে সেদিন আর বাড়ী ফেরা হত না। প্রবল বেগে wiper চালিয়ে ছোটালাম গাড়ী। শ্যামবাজার আসার আগেই ঝড়ের বেগও বেড়ে গেল। তখন আবার টালা ব্রীজের কাজ চলছে, লকগেট দিয়ে আসতে হবে। পাখীর হাটের রাস্তা দিয়ে লকগেটে এসে দেখি বন্ধ। পাশের রাস্তা ধরে কাশীপুর ঘুরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়েই টের পেলাম ঝড়ের গতিতে সব লণ্ড ভন্ড হচ্ছে। আমার যে রাজকর্মচারি ভাই আমাকে দুপুর দুটোর আগে ছেড়ে ডিউটি ধরেছিল, সে পরদিন

দুপুর দুটোর আগে বাড়ী ফিরতে পারেনি। যাবে কি করে? গাছ পড়ে কলকাতার রাস্তা সব বন্ধ। পরের ডাক্তার হাসপাতালে না এলে ও তো আর বাড়ী যেতে পারে না।

লক ডাউনের প্রথম দিকে, এক রাত্রে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে চলেছি। বেলগাছিয়া রোডে ওঠার আগে সিগন্যাল এ দাঁড়িয়েছি। এমন শুনশান কলকাতার রাস্তা আর কোনোদিন দেখিনি। সত্যিই রাস্তায় শেয়াল কুকুর নেই। হঠাৎ আমার পাশে একটি মোটর বাইক এসে দাঁড়াল। আরোহী ছেলেটি হিন্দিতে জানতে চাইল, শিয়ালদা কোন দিকে। বললাম, ডান দিকের রাস্তা ধরে যেতে। কিন্তু শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এমন নির্জন রাতের রাস্তায় জীবনে আর কখনো বের হতে হবেনা। আমি তো আর রাজ কর্মচারি নই।

আজ সকাল থেকেই যে সকল রাজ কর্মচারি ভোটের ডিউটি করতে বেরোচ্ছেন তাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মেজদার কথা মনে পড়ল। আমরা ঐদিন দুপুরে শিশু কন্যাকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করেছি। রাত্রে হাসপাতালের পাশের দোকানে খেতে গিয়ে, ফট ফাট পটকার শব্দ শুনেছি। আমাদের খাওয়া হতেই দোকানদার বলল, আপনারা হাসপাতালে থাকবেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকে যান, শব্দ শুনছেন তো! মেজদা পরদিনও হাসপাতালে এল না। কি ব্যাপার? ছোড়দা জানাল, গতকাল কলকাতায় ভোট ছিল, মেজদা ভোট নিতে গেছল। বাড়ী ফিরে অসুস্থ হয়ে গেছে। ওদের বুথের সহকর্মী এক ভোটারকে আই কার্ড দেখাতে বলেছিলেন। আনছি বলে লোকটি ফিরে গিয়ে পিস্তল হাতে ফিরে আসে। দাদার পাশেই তাঁর সহকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। যে সকল রাজ কর্মচারি আজ গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসবে পুরোহিত হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আমার আজকের মত একটি নিশ্চিন্ত অবসরের প্রার্থনা করি।

লাফ

সবথেকে কম বয়সে আপনি যে লাফ দিয়ে ছিলেন সেটা কি আপনার মনে আছে? যেটা মনে আছে সেটা কোথায়, কেন লাফিয়ে ছিলেন? আমার যেটা মনে আছে সেটা একটা শিশুদের খেলা। দুজন মুখোমুখি বসে পায়ের পাতা চারটি লাগিয়ে রাখবে, আর একজন ছুটে এসে ঐ জোড়া পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পেরোবে। তারপর একটা পায়ের পাতার উপর আর একটা পাতা দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো, তারপর হাতের আঙ্গুল ফাঁকা করে পায়ের পাতার উপর দিয়ে আর একটু উঁচু করে দেওয়া। এই ক্রমশ বাড়তে থাকা উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে পেরতে হবে। এর পরের খেলাটা ছিল পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়া। পুকুরের বাঁধানো ঘাট থাকলে তার উপর থেকে লাফিয়ে পড়া; আর না হলে পুকুরের উচু পাড় থেকে লাফ। অনেক সময় পুকুরের জলের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়া। গ্রীষ্ম কালে এক একজন বাচ্চা হয়তো কুড়ি বাইশ বার করে লাফাতাম। এই জলে লাফাতে গিয়ে আমার একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমদের গ্রামের সেই বারোয়ারী পাকা ঘাটের উপর থেকে লাফ দিয়ে জলে পড়লাম। জলের নিচে ছিল একটা ভাঙ্গা পিচের ড্রাম; আমার থাইয়ের মাঝে প্রায় তিন ইঞ্চি কেটে গেল। সেলাই -এর ভয়ে কাউকে না জানিয়ে চেপে গেলাম। সেই কাটার দাগ এখনও বোধ হয় খুজলে পাওয়া যাবে।

হাই স্কুলে পড়ার সময় বাৎসরিক প্রতিযোগিতার সময়ে পারি না পারি দৌড় ঝাঁপ সব বিভাগেই নাম দিতাম। মেয়েদের একটা খেলা ছিল স্কিপিং দৌড়। স্কিপিং বা লাফ দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়। আমাদের খেলার সাথী জয়ন্তী নামের একটি মেয়ে প্রতি বছর প্রথম হত। ছেলেদের লং জাম্প আর হাই জাম্প হত। লম্বা লাফ দেওয়ার জন্য মাঠের পাশে একটা চৌবাচ্চা মত কেটে বালি দিয়ে ভরানো হত। ঐ, বছরে দিন সাতেক ওখানে কয়েক জন লাফানো অনুশীলন করতে যেতাম। হাই জাম্প আমরা দড়ির ওপর দিয়ে লাফাতাম , উল্টো দিকে পড়বার জায়গায় সোজা মাটিতে পড়ার ব্যবস্থা। অনেক পরে জেনেছি যে আড়াআড়ি ছুটে এসে একটা ডান্ডার ওপর দিয়ে পেরিয়ে মোটা গদির ওপর পড়ে, বড় বড় লাফিয়েরা। আমরা কলেজে পড়ার সময় থেকে শুনতে পেতাম রাশিয়ার সেরগেই বুবকার নাম। পোল ভল্ট নামের এক রকম খেলায় রেকর্ড ভাঙ্গার রেকর্ড করেছিল। সে বোধ হয় লাফিয়ে দোতলা বাড়ির ছাদে উঠতে পারতো। এই লাঠির সাহায্যে লাফানো নিয়ে আমাদের গ্রামের ওদিকে তখন একটা প্রবাদ বাক্য খুব শুনতাম। “বাঘ লাফায় বার, হরিণ লাফায় তের আর সোনামুখীর বাগদি লাফায় পনের।” পনের হল পনের হাত দূরে লাফানো। আসলে আমাদের ওদিককার সোনামুখী গ্রামের লাঠিয়াল বাহিনীর ঐ রকম কিংবদন্তি সুনাম ছিল।

খেলার মাঠে লাফানোর আর একটা ব্যাপার আমদের ছোট বেলায় আমাকে মুগ্ধ করত। ভলি বল খেলায় নেটের কাছে দাঁড়ানো খেলোয়াড় লাফিয়ে উঠে বলে প্রচন্ড জোরে চাঁটি মেরে উল্টো দিকে নামাত, এটা আমার খুব ভাল লাগত। ফুটবল খেলার মাঠে

লাফিয়ে উঠে হেড করার থেকেও গোল কিপারের লাফিয়ে গোল বাঁচানো দেখতে আমার বেশী ভালো লাগে। পাশে লাফিয়ে পড়ে বল ধরা যাকে ইংরেজিতে 'ডাইভ' বলে তার হিন্দিটা বেশ মজার; "ছ্যালাং!

আমরা যখন হোস্টেলে থাকতাম , একবার কোন কাজে ,এক গাড়ী বালি এনে নিচে রাখা ছিল। দোতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন কথা বলতে বলতে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া নিয়ে বোধ হয় বাজী রেখে কিছু হয়েছিল। আমদের খুব প্রিয় শ্যামাদা ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বালির ওপর। কোমরে চোট পেল জোর। সবাই ভয় পেয়ে গেল। ভাগ্য ভাল যে খুব খারাপ কিছু হয়নি। এই শুনে আমদের এক ভাই বলেছিল একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা। ওদের গ্রামের বাড়িতে চোর এসেছিল। হৈ হৈ শুনে ওদের এক দাদা দোতলা থেকে নিচে খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়ে। তারপর থেকে আর কথা বলতে পারেনি। সেই দাদা আর কোনদিন কথা বলতে পারল কি না আমার জানা নেই।

সবথেকে লম্বা লাফ যার কথা আমরা সবাই জানি, সেটা হল রামায়ণে বীর হনুমানের লাফিয়ে সমুদ্র পেরনো। আজকের দিনে রূপকথার গল্পের মত মনে হয়। কিন্তু কোন এক গবেষক এই লাফের প্রসঙ্গে "লাঙ্গুলেন" কথাটা পেয়েছেন। লেজের সাহায্যে এত লম্বা লাফ? তাহলে কি তখন মিসাইলের মত কিছু ব্যবহার করে হনুমান সমুদ্র পেরিয়েছিলেন? বর্তমান যুগে সবথেকে উঁচু থেকে লাফ দেওয়া হয়, প্যারাসুট নিয়ে কয়েক হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়া। আমাদের সময়ের সবথেকে বিখ্যাত প্যারাশুট লাফ কোনটা মনে আছে? বীর যোদ্ধা অভিনন্দন বর্তমান পাকিস্থানের একটি যুদ্ধ বিমানকে ধ্বংশ করে নিজে লাফিয়ে নেমেছিলেন।

মাছেদের স্বভাব হল , উপর থেকে জল নামছে দেখলেই লাফিয়ে ওঠে। ওদের এই স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে আমরা মাছ ধরার ফাঁদ পাততাম। মাছেরা কিসের নেশায় লাফিয়ে উঠে আত্মহত্যা করে জানার উপায় নেই। একটি মাছ লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে বেঘোরে প্রাণ হারায়। ওর পিছনে থাকা অন্য মাছেরা জানতে পারে না এর করুন পরিনতি। ছাত্র যুবাদের একই ভাবে তাতিয়ে তোলে নেতারা। এরা ভালো মন্দ বিচার না করে বিপদের মুখে লাফিয়ে পড়ে। আমদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রমিরা নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেশের সেবায় লাফিয়ে পড়েছিলেন।

ট্রেনে বাসে লাফিয়ে ওঠা বা নামা খুব দেখা যায়। কিছু চ্যাংড়া- ব্যাংড়া দেখবেন অকারনে লাফিয়ে নামছে বা উঠছে। জানবেন কোনটাই অকারণ নয় ;ওটা ওদের ট্রেনিং চলছে। আমার চোখের সামনে দু'বার দেখেছি, মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিঁড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামল একটা ছেলে। এই লাফও ওদের জীবিকার সাথে যুক্ত। আমাকে এক বিখ্যাত প্রফেসার বলেছিলেন, " তুমি তো সাপের কামড় নিয়ে কিছু করার জন্য খুব লাফালাফি করছ"! সত্যিই, বারো -তের বছর ধরে একটা গ্রামীন সমস্যা নিয়ে যা লাফালাফি করলাম , সবটা জুড়লে একটা সমুদ্র পেরোনো যায়; কিন্তু আমাদের শহুরে নেতাদের কানে কথাটা ঢোকাতে পারছি না।

প্রাণীদের মধ্যে বাঁদর আর ব্যাঙ এর লাফ বিখ্যাত। কুকুর বিড়ালও খুব ভাল লাফাতে পারে। ওদের ওই লাফ দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা ওদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। মানুষ কেন লাফায়? ছোট বেলায় লাফানোর যে খেলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে শিশু, মনের আনন্দে লাফায়। আবার আমেরিকায় সেই একশ তলার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঁচার চেষ্টা! মৃত্যু ভয়ে মানুষ কেমন পাগল হয়ে যায়, ওটা তার উদাহরণ। মানুষ মরবার জন্যও লাফায়; দশ তলার উপর থেকে লাফ, ট্রেনের সামনে লাফ কিংবা গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা । কিংবা মধ্য যুগে বন্দিনী মহিলাদের জহর ব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ!

সামান্য একটা ব্যাঙের লাফ একটা শান্ত পুকুরে যেমন তরঙ্গ তোলে, তেমনি চিন্তার তরঙ্গ তুলেছিল জাপানী সাধক কবি মাৎসুয়ো বাসোর মনেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর জন্মের প্রায় দুশ বছর আগে ,অনু কবিতা বা হাইকু লিখেছেন বাসো।

" শান্ত পুকুর

নির্জন দুপুর

ব্যাঙের লাফ

ক্লপ"!

জাপানী সাধক কবি মাৎসুয়ো বাসো

লোপামুদ্রা

যা নেই ভারতে তা নেই ভূ ভারতে। আমাদের ছোট বেলায় শোনা ইল্বল আর বাতাপি রাক্ষসের গল্পও যে মহাভারতের গল্প তা তো জানতাম না। কত ছোট বেলায় সে গল্প শুনেছিলাম , বলতে পারছি না। তখন গল্পটা ছিল , দুই রাক্ষসের বামুন মেরে খাওয়ার গল্প। ইল্বল রাক্ষস বামুনদের নিমন্ত্রন করত। তার ভাই, মায়াবী রাক্ষস বাতাপি একটা ছাগল হয়ে যেত। বামুনদের সেই ছাগলের মাংস কেটে খাওয়ান হত। পেট ভরে খেয়ে বামুনরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই, বাতাপি তাদের পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে আসত। এর পর দুই রাক্ষস সেই বামুনদের মাংস খেত। এই বদমাশ রাক্ষস দুটিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগস্ত্য মুনি তাদের বাড়ী গিয়ে ছাগলের মাংস খেলেন। মহা তেজস্বী মুনি বাতাপি রাক্ষসকে একেবারে হজম করে ফেললেন। আগের মত ইল্বল রাক্ষস ভাইকে ডাকতে থকল; কিন্তু সে আর বেরল না। তখন ইল্বল রাক্ষস মুনির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

এই মহা মুনী অগস্তের আরও গল্প আমরা শুনেছি। এই মুনীর শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত মাথা তুলে সুর্যের যাতায়াত আটকে দিচ্ছিল। মুনি শিষ্যের কাছে গেলে শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত মাথা নামিয়ে প্রণাম করল। মুনী তাকে না ফেরা পর্যন্ত ঐ ভাবে প্রণত হয়ে থাকতে বলে সেই যে দক্ষিনে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। পর্বত ঐভাবে মাথা নামিয়েই থেকে গেল। এই অগস্ত্য মুনীই রেগে গিয়ে এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল খেয়ে নিয়েছিলেন। এই রকম তেজস্বী ব্রহ্ম জ্ঞানী মুনীর স্ত্রী ছিলেন তেজস্মিনী লোপামুদ্রা।

এই লোপামুদ্রার কথা পড়তে গিয়ে আমাদের " ধর্ম গ্রন্থ" সম্বন্ধে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। বেদ- পুরান- মহাভারত আমাদের ধর্মগ্রন্থ। কিছু মানুষের এই ধর্ম বা ধর্মগ্রথ কথাগুলি সম্বন্ধে বিকট আপত্তি আছে। তাদের এই শব্দগুলি শুনলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। বেদ মন্ত্র বললেই আমরা জানি , " ওং, বোং , দেহী দেহী, স্বাহা স্বাহা" বলে আগুনে ঘি ঢালা। এই লোপামুদ্রা দেবী যে বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা , সেগুলি জানলে আর বেদ মানেই যাগ যজ্ঞ , দেবতার পূজা , এই ভুল ধারণা থাকবে না। এই লোপামুদ্রা ছিলেন , বিদর্ভ রাজার কন্যা। পরমা সুন্দরী এই রাজকন্যা দারুন বিদুষীও ছিলেন। তেজস্মিনী এই কন্যাকে বিয়ে করার সাহস কোন রাজার ছিল না। মহামুনী অগস্ত্য একদিন সেই বিদর্ভ রাজার অতিথি হয়ে এলেন। রাজা যথাযোগ্য চরণ বন্দনা ইত্যাদি করে মুনীকে আপ্যায়ণ করলেন । মুনী জানতেন রাজার বিদুষী কন্যার কথা। আসলে এই মুনীই যোগবলে নিজের ভবিষ্যতের স্ত্রী হিসেবে এই কন্যাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এমন এক কাঠখোট্টা মুনীর সাথে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাবা মায়ের আপত্তি থাকবেই। কিন্তু মুনীর তেজের কথা মাথায় রেখে ওনারা সে কথা বলতেও পারছেন না। এদিকে এমন এক মহামুনী তাকে বিয়ে করতে চায় জেনে রাজকন্যা লোপামুদ্রা নিজেই রাজাকে তার সম্মতির কথা জানালেন। রাজকীয় আড়ম্বরে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কৌপীনধারী মুনি সালঙ্কারা বধু নিয়ে আশ্রমে যাচ্ছেন, এ খুবই বেমানান। মুনি তাই স্ত্রীকেও বল্কল পরিধান নিয়ে যেতে বললেন। লোপামুদ্রা তাই করলেন।

গঙ্গার ধারে মুনির আশ্রমে তাঁদের দিন কাটতে থাকল। বছরের পর বছর লোপামুদ্রা মহাতপস্বী মুনির কঠোর তপস্যায় সাহায্য , আর স্বামী সেবা করে গেলেন। তপস্বী মুনি তাঁর ঈশ্বর লাভের তপস্যার অঙ্গ হিসেবে ব্রহ্মচর্য পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে নিজেও তপস্যা করতে করতে লোপামুদ্রার এক সময় মনে হতে থাকল , তাঁর বিবাহিত জীবন বৃথা। প্রতিদিন সকাল হলেই তাঁর মনে হতে লাগল, আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। শেষে একদিন তিনি বেশ রেগেই গেলেন । তখন তিনি বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য হওয়া উচিত , তাই বললেন, মুনিকে। এই যে কথাগুলি তিনি ঋক মন্ত্রের মত উচ্চারণ করলেন, এগুলিই চিরন্তন সত্য। মুনি যদি আজীবন ব্রহ্মচর্যই পালন করবেন, তাহলে বিয়ে করলেন কেন ? এই যে তপস্বিনী লোপামুদ্রা কিছু চিরন্তণ সত্যকে বলে ফেললেন , একেই বলা হয় , যেন তিনি সত্যকে দর্শন করলেন। তাই তিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, লেখিকা বা আবিস্কর্তা নন। তাঁর বলা কথাগুলি এতোই সত্য যে , ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যও নিজের ভুল বুঝতে পারলেন । তিনিও উত্তরে বিবাহিত স্বামীর স্ত্রীর সাথে কেমন ব্যবহার করা

উচিত তাই বললেন , বেদ মন্ত্রের আকারে। এবার খেয়াল করুন, এই যে দুজন মহাতপস্বী কয়েকটি বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করলেন , এর সাথে যাগ যজ্ঞ, পূজা পাঠের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলিই চির সত্য জীবন দর্শন। গোটা মহাভারত জুড়েই এরকম জীবন দর্শনের পাঠ দেওয়া হয়েছে। একেবারে দোষে গুনে একজন মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। এগুলিকেই কিছু মানুষ ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সমর্পনানন্দ মহারাজ একদিন মহাভারত পাঠের সময় মজা করে বলছিলেন, ঘরে মহাভারত রাখতে নেই । কেন? মহাভারত আসলে একটা আয়না। আমাদের মুখোশ খুলে দেয়।

মহিয়সী লোপামুদ্রা জানতেন , মহামুনি বংশ রক্ষার জন্যই বিয়ে করেছেন । কিন্তু নিজের তপস্যার কাজে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সেকথা ভুলেই গেছলেন। স্ত্রীর, মন্ত্রের মত অমোঘ কথাগুলি শুনে মুনির বোধোদয় হল। তিনি এবার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী হলেন । লোপামুদ্রা জানালেন যে তাঁদের দুজনের পোশাক আসাক , শয্যা ইত্যাদি তপস্যার জন্য উপযুক্ত, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমের উপযুক্ত নয়। মুনির উচিত স্ত্রী সঙ্গমের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা। এসবের জন্য কিছু অর্থের দরকার; মুনি কোথায় পাবেন । তিনি চললেন রাজাদের কাছে অর্থ চাইতে।

পরপর তিনজন রাজার কাছে অর্থ ভিক্ষা করে দেখলেন , তাঁরা তিনজনই অত্যন্ত ধর্মপথে রাজ্য চালান। রাজ্যের আয় ব্যায় সমান। মুনিকে অর্থ সাহায্য করতে গেলে, প্রজাদের উন্নতির অর্থ থেকেই দিতে হবে। মুনি এই টাকা নিতে রাজী নন। বেদ পুরাণের আদর্শ রাজা কেমন হয় আমরা কি একটু আভাস পেলাম ? তিন রাজা এবার দৈত্য রাজা ইল্বলের কাছে মুনিকে নিয়ে চললেন। এই ইল্বলকে চিনতে পারছেন ? ইনিই আমাদের সেই বামুনের মাংস খাওয়া ইল্বল। এবার মুনি একাই বাতাপি ছাগলের মাংস খেয়ে হজম করে দিলেন । ইল্বল রাজা ভয় পেয়ে মুনির পায়ে পড়ল। তিন রাজা আর অগস্ত্য মুনিকে যথেষ্ট টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করল। এইবার মুনি যথা যোগ্য মর্যাদায় স্ত্রীর সাথে সন্তান উৎপাদনে মিলিত হলেন । এনাদের যে ছেলে হল , তিনি একজন কবি।

মহাভারতের কাহিনীগুলি পড়তে গিয়ে , আমার নিজের উপলব্ধির কথা বলছি। তাই পড়ে আমার এক সহৃদয় পাঠক বলেছেন, আপনার লেখার উদ্দেশ্য বিধেয় কিছুই বুঝলাম না। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন ধর্মালোচনা বা প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। আমার জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার সাথে মহাকাব্যের কোন ঘটনার যোগ পেয়ে হয়তো চমৎকৃত হয়েছি। এই নিবন্ধটি লেখার মূলে ঐ লোপামুদ্রা নামটি। আমরা খনা , লীলাবতি, অরুন্ধতির নাম পুরানাদিতে পেয়েছি। আমার এক আত্মীয়ার নামটি কোন পুরান বা মহাকাব্যে আছে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি আমার সবথেকে প্রিয় বিশয় মহাভারতেই তিনি বিরাজমান। তাঁর কথা পড়তে গিয়ে প্রায় ষাট বছর আগে শোনা গল্পটির উৎস জেনে পুলকিত হয়েছি। আরও বেশী অভিভুত হয়েছি, তাঁর দেখা বেদ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই এর লেখায় পড়ে।

মহাভারতে সব কিছুই আছে। কথায় বলে, যা নেই মহাভারতে তা নেই ভু-ভারতে। তো, আমরা যারা সাপের কামড় নিয়ে কাজ করি তাদের জন্যও কি কিছু লেখা আছে মহাভারতে? মহাভারতের কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত লেখা আমি পড়ে চলেছি বছর পনের হবে। এই করোনা মহামারীর বছর দেড়েক ধরে, ইউটিউব-এ মহারাজ সমর্পনানন্দের মহাভারত পাঠও নিয়মিত শুনছি। এই পাঠ শুনতে শুনতেই একদিন মহাসর্প নহুষের কাহিনী শুনলাম; মনে পড়ল ঐ বছর পনের আগেই একবার ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান" বইতে এ নিয়ে কিছু পড়েছিলাম। আবারও বই বের করে সেসব কাহিনী পড়তে হল।

সাপের প্রসঙ্গ মহাভারতে বেশ কিছু জায়গায়ই আছে। মহাভারতের কথা শুরুই হয়েছে মহারাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের কথা দিয়ে। এই মহারাজা জনমেজয় হলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের নাতি পরীক্ষিত -এর ছেলে। এ আবার কেমন হল? পাণ্ডবরা গোটা মহাভারত জুড়েই নানান কাণ্ড ঘটিয়েছেন; তাঁদের আগেও তাঁদের পিতামহ অতি বিখ্যাত ভীষ্মকে নিয়ে এত সব কান্ড, সেসব ছেড়ে তিন চার প্রজন্ম পরে মহাভারত শুরু হয়েছে? এ কেমন কথা! মজার কথা হল সাধারণ ভাবে মহাভারত নিয়ে যে সব বিচিত্র কাণ্ড কারখানার কথা আমরা জানি, তার কয়েকশ প্রজন্ম আগের কথাও লিখে গেছেন, মহাকবি ব্যাসদেব। এমন কি ব্যাসদেব নিজের জন্মের বিচিত্র বৃত্তান্তও বিস্তারে লিখেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যুর চক্র ব্যুহে মৃত্যুর কথা আমরা জানি। সেই সময় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত, মা উত্তরার গর্ভে। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন আবার সিংহাসনে বসেন সে সময় পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। ওনার যখন ছত্রিশ বছর বয়স তখন ওনাকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন। এই রাজা পরীক্ষিত একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে বনের প্রান্তে তপস্যারত এক মুনির গলায় একটি মরা সাপ জড়িয়ে দিয়ে আসেন। শমীক মুনি মৌনব্রত পালন করছিলেন তাই রাজার প্রশ্নের উত্তর দেন নি; এতেই রাজা বিরক্ত হয়ে ঐ মরা সাপ মুনির গলায় জড়ানোর বদ রসিকতাটি করেন। কিন্তু মুনির বালক পুত্র শৃঙ্গী এই ব্যাপারটি জানতে পেরে ,রাজাকে সাত দিনের মধ্যে সাপের আক্রমনে মরনের অভিশাপ দেন। সেই ঋষি বালকের অভিশাপে সপ্তম দিনেই তক্ষক নাগের আক্রমনে রাজা পরীক্ষিত মারা গেলেন। পরীক্ষিত-এর ছেলে জন্মেজয় রাজা হলেন। বেশ কিছু বছর পরে, বাবার মৃত্যু তক্ষক নাগের আক্রমনে হয়েছে জেনে , জন্মেজয় পিতৃহত্যার অভিযোগে সব সাপেদের পুড়িয়ে মারার জন্য বিশাল সর্প যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞ চলার সময় মহাকবি ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি সেখানে আসেন এবং মহাভারতের কাহিনী শোনান।

মহাভারতের কাহিনীর শুরু কিন্তু আগে যেমন বলেছি, ধৃতরাষ্ট্র -পাণ্ডুদের প্রজন্মের প্রায় একশ প্রজন্ম আগের থেকে শুরু। এর মধ্যে তিনবার আমি সাপের বা নাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। এছাড়া মহাভারতে আরও বেশ কিছু জায়গায়ই সাপ বা নাগের

প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সবথেকে পুরনো কাহিনী হল বিখ্যাত সমুদ্র মন্থনের কাহিনী। সেখানে মন্থন রজ্জু হিসেবে বিশাল বাসুকী নাগকে ব্যবহার করা হয়েছে। চন্দ্র দেবতার বংশধর বিখ্যাত রাজা নহুষ পৃথিবীর রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশাল ব্যাক্তিত্ব, বীরত্ব ইত্যাদির জন্য একসময় তাঁকে স্বর্গ রাজ্যেরও রাজা করা হয়। কিন্তু স্বর্গের রাজা অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব পেয়ে একসময় তাঁর মাথা ঘুরে গেল; তিনি আগের ইন্দ্র দেবতার স্ত্রী শচি দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। এই করতে গিয়ে এমন উদ্ধত হয়ে উঠলেন যে , মহামুনি অগস্ত্য রেগে গিয়ে রাজা নহুষকে সাপ হয়ে জন্মানোর অভিশাপ দিলেন। সাথে সাথেই রাজা নহুষ এক বিরাট অজগর সাপের চেহারা নিয়ে মর্তে নেমে এলেন। এই অজগররূপী সাপ একদিন মহাবীর ভীমকে পেঁচিয়ে ধরে প্রায় খেয়েই নিচ্ছিলেন। অগস্ত্য মুনির কথা মত, নহুষের বহু পুরুষ পরের বংশধর মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপ মুক্ত করেন।

ছোট বেলায় খেলার সময় দুর্যোধন ভীমকে খাওয়ার লোভে ফেলে, বিষ খাইয়ে নদীতে ফেলে দেয়। অজ্ঞান ভীম ভাসতে ভাসতে নাগ রাজার রাজ্যে পৌঁছলে, নাগেরা তাকে সুস্থ করে বাড়ী ফেরায়। খান্ডব বন দহনের সময় সেই বনে থাকা ভয়ংকর তক্ষক নাগকে অর্জুন মেরে তাড়িয়ে দেন। এই অর্জুনই আবার বারো বছর ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে গোটা ভারত ভ্রমণের সময় , নাগ কন্যা উলুপিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বাল্য আর বৃন্দাবন লীলার কথা সরাসরি মহাভারতে নেই। বাল্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করে, যমুনার জল বিষ মুক্ত করেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে কৌশলে হত্যা করার আগে, তাকে ভয় দেখানোর জন্য একটি বিষধর সাপ হাঁড়িতে ভরে কালযবনের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই যে এতগুলি জায়গায় সাপ বা নাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম, এর মধ্যে সেই ধ্যানমগ্ন শমীক মুনীর গলায় জড়ানো মরা সাপ আর কালযবনকে পাঠানো সাপটি ছাড়া বাকিগুলি আদৌ কোন সাপ নয়। আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন, তক্ষক, কালীয়, উলুপী বা নহুষ কেউই সাপ ছিলেন না। আসলে এঁরা সকলেই নাগ জনজাতীর মানুষ ছিলেন। নাগকন্যা উলুপি আর অর্জুনের বীর পুত্র ইরবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বাবার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উলুপী সাপ নয়, মানবী ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে, তক্ষক নাগের আক্রমণে পরীক্ষিত-এর মৃত্যর ক্ষেত্রে কোথাও বলা হয়নি , তক্ষক সপের কামড়ে রাজা মারা গেলেন।এমন কি শমীক মুনীর ঋষি পুত্র শৃঙ্গীও যখন অভিশাপ উচ্চারণ করেন, তিনি বলেছেন, “তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ রাজাকে মারবে।“ এই সাতদিনে রাজার মৃত্যুর অভিশাপ ব্যাপারটি শান্ত মুনীবর শমীকের আদৌ ভালো লাগেনি; এটাকে তিনি পুত্রের বালকোচিত হঠকারিতা বলেই বুঝেছেন। কিন্তু বালক হলেও ব্রাহ্মণ ঋষির কথা মিথ্যা হতে পারে না। তবুও শমীক

মুনীর মনে হয়েছে, রাজাকে সাবধান করা তাঁর কর্তব্য; তিনি এক শিষ্যকে পাঠিয়ে রাজাকে সব খবর দিলেন। নিজের হঠকারিতা ও অন্যায় বুঝতে পারলেন রাজা পরীক্ষিত। তিনি জেনেই গেলেন, আর মাত্র সাতদিন আয়ু আছে। পৌরাণিক কাহিনীর স্বাভাবিক ধারায় , রাজার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করা হল। এই শেষ সাতদিন রাজা শুধুই মুনি ঋষিদের কাছে ধর্ম আলোচনা শুনে কাটাবেন ঠিক করলেন। খবর পেয়ে নানা দিক থেকে মুনি ঋষির দল এসে রাজাকে ধর্ম কথা শোনাতে লাগলেন। এই সময়ই ব্রহ্মর্ষি শুকদেব এসে রাজাকে বৈষ্ণবদের পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ শোনান। এইখানেই ভাগবত পুরাণ রচনা হল।

মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে রাজার ধারে কাছেও যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। মহাভারতের কাহিনী বলছেন, মুনি ঋষিদের দেওয়া ফল মূল ছাড়া রাজা আর কিছু খাচ্ছিলেন না। তক্ষক নাগ একটি মিষ্টি ফলের মধ্যে ছোট্ট কৃমি কিট সেজে রাজার কাছে পৌঁছে যান, এবং সপ্তম দিন সন্ধ্যায় রাজাকে হত্যা করেন। বাস্তব ব্যাখ্যা হল, নাগ জনজাতীর রাজা তক্ষক, মুনি ঋষিদের দলে মিশে রাজার কাছে পৌঁছে যান, এবং রাজাকে হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করেন।

মহাভারত পুরাণের কাহিনী আমাদের সব সময়ই কিছু না কিছু জীবন ধর্ম শিক্ষা দেয়। এই রাজা পরীক্ষিত-এর শেষ সাতদিন এর কাহিনী থেকে আমরা কি শিখলাম? ঐ যে মরা সাপ নিয়ে বদ রসিকতা, ওটাই রাজার কাল হল। আজকের দিনেও এই মরা সাপ নিয়ে বদ রসিকতা বা নাড়াচাড়া বিপজ্জনক। আমরা যারা সাপের কামড় নিয়ে কাজ করি, আমরা জানি , মরা সাপও বিপজ্জনক। বিষধর সাপ মরে যাওয়ার পরও তাদের বিষ থলিতে বিষ থাকে। কোন রকমে ঐ মরা সাপের বিষদাঁত হাতে পায়ে ফুটলে মারাত্মক হতে পারে। আর একটি দিক হল বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন। আমরা দেখেছি, সাপ দেখলেই মেরে ফেলা লোকজনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। দেশের আইন অনুযায়ী কোন সাপকেই মারা যায় না। বাঘ, হাতি, কৃষ্ণসার হরিণ মারলে যেমন জেল জরিমানা হতে পারে; একটা হেলে সাপ মারলেও তাই হতে পারে। মরা সাপ নিয়ে রসিকতা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিলেও এই রকম আইনী ব্যবস্থার জালে জড়াতে পারেন। আমাদের পরিচিত একজন বিজ্ঞান কর্মী একবার এরকম একটি জটিলতায় জড়িয়েছিলেন।

আমরা আবার মূল মহাভারতে ফিরে যাই। পান্ডবদের বনবাস শেষ হয়ে আসছে। অর্জুন স্বর্গ থেকে নানান দীব্যাস্ত্র নিয়ে ফিরেছেন। পণ্ডবরা সবাই একটু চাপ মুক্ত, খুশী খুশী আছেন। বিশাখ-যুপ নামের একটি বনে তখন ওনারা থাকছেন। ভীম একদিন মনের আনন্দে বনের মধ্যে শিকার করতে করতে একটি গুহার মুখে এসে পড়েছেন। গুহার মুখের কাছেই একটি বিরাট অজগর সাপ শুয়ে ছিল। ভীম কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই অজগর সাপ তাকে পেঁচিয়ে

ধরলো। আগে অনেক বড় বড় রাক্ষস ইত্যাদি মারলেও, অজগরের কবলে পড়ে ভীমের নড়া চড়ার ক্ষমতা রইল না। ভীম অবাক হয়ে বললেন, এ তো সাধারণ সাপ নয়, এ নিশ্চয়ই কোন স্বর্গচ্যুত দেবতা হবেন। তখন সেই অজগর, মানুষের গলায় বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একসময় স্বর্গের রাজা ছিলাম, অগস্ত্য মুনির অভিশাপে আমি হাজার বছর ধরে সাপ হয়ে পড়ে আছি।" ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সাপ জানান , "মুনির কথা মত, দিনের শেষে যে-ই আমার নাগালের মধ্যে আসবে তাকেই আমি শিকার করতে বাধ্য।" তবে তোমার দাদা, মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তুমি ছাড়া পাবে। এদিকে যুধিষ্ঠির-এর হঠাৎ খেয়াল হল যে, অনেকক্ষণ বনের দিক থেকে ভীমের হুংকার শোনা যাচ্ছে না। ভীমের কিছু বিপদ ঘটেছে আন্দাজ করেই যুধিষ্ঠির বনের যেদিক থেকে ভীমের হুংকার শোনা যাচ্ছিল সেদিকে ছুটলেন।

সেই গুহার সামনে পৌঁছে যুধিষ্ঠির দেখলেন, ভীমের করুন অবস্থা। যুধিষ্ঠিরকে দেখেই সেই মহাসর্প মানুষের ভাষায় অভিবাদন জানালেন। যুধিষ্ঠিরও মহা সর্পকে অভিবাদন জানিয়ে ভাইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অজগর নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তিনি অগস্ত্য মুনির শাপে হাজার বছর ধরে এভাবে সাপ হয়ে পড়ে আছেন। মুনির কথা মত যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপ মুক্ত করতে পারেন, যদি তাঁর প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিতে পারেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রশ্ন জানাতে অনুরোধ করলেন। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, বকরূপী যক্ষের সাথে যুধিষ্ঠিরের সেই বিখ্যাত প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে অজগররূপী রাজা নহুষ একটিই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। তিনি বললেন, "ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণ কে?" উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, "হে আমার শ্রদ্ধেয় পুর্বপুরুষ মহারাজা , যাঁর মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম, অনৃশংসতা, তপস্যা এবং দয়া এই সকল গুণনগুলি থাকে তিনিই ব্রাহ্মণ।" প্রাক্তন স্বর্গাধিপতি নহুষও একসময় মহাজ্ঞানী ছিলেন; তিনি এত সহজে যুধিষ্ঠিরের কথা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তাহলে তো বৈশ্য, শূদ্র যে কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারে! যুধিষ্ঠির জানালেন যে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। জন্ম দিয়ে কারো বর্ণ নির্ধারণ হয় না। যার মধ্যে ঐ কটি গুণ থাকবে তিনিই ব্রাহ্মণ; আবার কোন ব্রাহ্মণ কখনো ঐ সকল চারিত্রিক গুণাবলী থেকে বিচ্যুত হলেই আর তিনি ব্রাহ্মণ থাকবেন না। আবার শূদ্র হয়ে জন্মেও কেউ যদি ঐ সকল গুণাবলি অর্জন করেন, তাঁকে ব্রাহ্মণই বলা হবে । এ কথা শুনেই অজগর সাপের মূর্তি ছেড়ে নহুষ দিব্য দেহ ধারণ করলেন; স্বর্গের দিব্য যান তাঁকে নিয়ে গেল।

মহাভারতের এই নহুষ কাহিনী আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে জন্মেও কোন ব্যানার্জী, চ্যাটার্জি বা ভট্টাচার্য্য যদি যুধিষ্ঠিরের বলা গুণগুলি থেকে দূরে সরে যায়, তাকে আর ব্রাহ্মণ বলা হবে না। একটা দেড় টাকার পৈতা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেই তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন না। মহাভারতে এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের বাড়িতে জন্মেও একজন মানুষ ব্রাহ্মণ হয়েছেন। আবার ব্রাহ্মণ সন্তান দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন। স্বয়ং ব্যাসদেব জেলেনীর গর্ভে জন্ম নেন, কিন্তু তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথাকে যারা গালমন্দ করেন, তাঁদের একবার মহাভারতটা পড়ে নিতে অনুরোধ করছি।

অজগর, বিষ নেই, পেঁচিয়ে মারে।

সর্ষের ফুল

সর্ষের ফুল নিয়ে দুটি খুবই প্রচলিত কথা চালু আছে। একটা হল চোখে সর্ষে ফুল দেখা। আর একটা হল , সর্ষে ফুল দূর থেকে ঘনই দেখায়। সর্ষে ফুল দেখা কথাটা খুবই চালু হলেও, কি করে এমন একটা ভুল কথা এভাবে চলে আসছে জানিনা। যে অর্থে ব্যবহার করা হয় কথাটা, সেদিক দিয়ে দেখলে , এটা ভুলই বলা হয়। লোকে বিপদে পড়লে বা খুব বিভ্রান্ত হলে বলা হয়, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। সর্ষে ফুল উজ্জ্বল হলুদ রঙের। একজন লোক যখন খুব ঘাবড়ে যায় বা আমরা যাকে বলি মাথা ঘুরে পড়ে যায় , তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। ইংরেজীতে একে ব্লাক আউট বলে। একমাত্র যদি চোখে আঘাত লাগে তাতে কখন কখন চোখের সামনে আলোর ফুলকি দেখা যেতে পারে। সেটা সর্ষে ফুলের মত হলুদ হবে কেন ?

সর্ষে ফুল ঘণ দেখাটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও ঠিক । আবার রূপকার্থেও ঠিক । মাঠে যখন সর্ষে ফুল ফুটে থাকে , একটু দূর থেকে দেখলে যতোটা ঘন দেখায় , কাছে গেলে ততোটা দেখায় না। এটা যখন রূপকার্থে বলা হয় তখন বোঝানো হয় যে , যে কোন মানুষ বা বিষয়কে বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখে অনেক সময়ই আমরা আসল লোকটির দোষ -গুন বা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারি না। লোকটিকে বুঝতে হলে তার সাথে মিশতে হবে। বিষয়টিকে বুঝতে হলে তার ভেতরে ঢুকতে হবে।

আমি কিন্তু আজ আক্ষরিক অর্থেই মাঠে ফুটে থাকা হলুদ সর্ষে ফুলের কথাই বলতে চাইছি। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে আমি যখন মেদিনীপুরের গ্রামে থাকতাম তখন এমন ব্যাপক সর্ষে চাষ দেখিনি। আলু চাষের সাথে সামান্য সর্ষে চাষ হত। তখন কিন্তু আজকের মত এমন মাঠের পর মাঠ হলুদ ফুলে ঢেকে আছে এমন দেখিনি। তার আগে দেখতাম, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বা পৌষ মাসের মধ্যে মাঠের আমন ধান কাটা হয়ে গেলে, মাঠে খেসারী কলাই হত। পরের দিকে, মাঠের পর মাঠ বোরো ধানের চাষ। শীত কালেও মাঠ সবুজ হয়ে থাকত। এমন মাঠের পর মাঠ হলুদ রং এর সর্ষে ফুল ফুটে আছে প্রথম দেখি উত্তর দিনাজপুর জেলায়। ১৯৯৫ সালের শীতকালে প্রথম পালস পোলিও টিকার অভিযান শুরু হয়। আমি তখন একটা বড় ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক। প্রথমবার; কারো কোন ধারণা ছিল না। জেলা আপিস থেকে জানানো হল, গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করে জনগণকে জানাতে হবে। আমার আটচল্লিশটি টিকা দেওয়ার সাব সেন্টার ছিল। সব মিলে একশ মত ফিল্ড স্টাফ। তাদের কিছু কিছু টাকা ধরিয়ে প্রচার করার ব্যবস্থা হল। আমার আপিসে একজন বেশ বয়স্ক আর দক্ষ কর্মচারী ছিলেন, হারাধন বাবু। গোটা ব্লকের সবকটা রাস্তা, মাঠের আল, গাছপালা ওনার নখ দর্পণে ছিল। আর চিনতেন প্রতিটি ফিল্ড স্টাফকে। আসলে উনি হাড়ে হাড় চিনতেন। সেই ঐতিহাসিক দিনটির, দিন দশেক আগে আমাকে বললেন, শুধু ফিল্ড স্টাফদের উপর নির্ভর করে হবে না, আপনাকেও প্রচারে বেরোতে হবে। জেলা আপিস থেকে একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করা হল। সাধারণত আমার সাথে হারাধন বাবু থাকতেন; মাঝে মাঝে আর এক- দু'জন। আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করে ঘুরতাম। তখনই দেখতাম, রাস্তার পাশের

মাঠে মাঠে হলুদ সর্ষে ফুল ফুটে আছে। হারাধনবাবু বা অন্য কেউ বলেছিলেন, সর্ষের ফুল আর শাক খেয়ে ঐ সময় বাচ্চাদের খুব পেটের অসুখ হয়। পেটের অসুখ অনেক হলেও সেটা সর্ষের ফুল খাওয়ার জন্য কিনা আমি জানিনা।

ধান ভাঙতে শীবের গীত কেন গাইছি? বলতে চাইছি সর্ষে ফুল -এর কথা, শুনিয়ে দিলাম পালস পোলিও টিকার অভিযান এর গল্প। আসলে ঐ অভিযানের সময় দিনাজপুর জেলার গ্রামের ভেতরে ভেতরে যেমন ঘুরেছি, আর কোন জেলায় তেমন ঘুরিনি। পালস পোলিও অভিযানের আর একটা ঘটনা বলি। ঐ প্রথম বারই , ঐ ঐতিহাসিক দিনে আমি আর হারাধন বাবু চলেছি একটা পাকা রাস্তা দিয়ে, সেই সরকারী জীপ গাড়ী করে। আজ মোবাইল ফোন এসে যাওয়ার পর , আমাদের সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা ভাবলে হাসি পায়। একটা ব্লকে একশ দশটা পোলিও টিকার বুথ করা হয়েছে। দুটি মাত্র গাড়ী , আর জেলা হাসপাতালের টেলিফোনটি সম্বল। সকাল আটটা থেকে সব বুথে বিশেষ ঠান্ডা বাক্সে করে পৌঁছনো পোলিও টিকা বাচ্চাদের খাওয়ানো হবে। চলবে বিকাল চারটে পর্যন্ত। তারপর সবকটি বুথের বাক্স আর বাচ্চাদের নামের তালিকা ফেরত আনতে হবে। সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে জেলা দপ্তরে জানিয়ে দিতে হবে, কতগুলি বাচ্চাকে টিকা খাওয়ানো হয়েছে। আমার ফিল্ড স্টাফদের একটা জবাবদিহি করার সামান্য সুযোগ থাকলেও , অন্য যে সকল লোকের সাহায্য নিতে হয়েছিল, তারা ঐ শীতের সন্ধ্যায় আমার আপিসে আসতে চাইবে কেন? তাই যে যে বুথে আমার আপিসের ফিল্ড স্টাফ ছিল না, সেগুলি থেকে আমরাই বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে আসব, এমনই ঠিক ছিল। কথা হচ্ছিল পাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ী করে যাওয়ার। শীতের সূর্য একটু আগেই ডুবেছে। দূরে দূরে মাঠে ফুটে থাকা হলুদ সর্ষে ফুল একটু একটু করে আবছা হয়ে আসছে। ঐ বর্ণহীন সর্ষে ক্ষেতের ওপাড়ে যে গ্রাম আছে সে আর বোঝা যাচ্ছে না। একটা মাঠের আলের মত গ্রামের রাস্তা যেখানে পাকা রাস্তায় মিশেছে সেখানে একটা ছোট্ট চালা ঘর। হারাধন বাবু বললেন, ঐ রাস্তার মুখে একজন বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে দাঁড়ানোর কথা। সোয়া পাঁচটা বেজে গেল, কেউ তো নেই। এবার আমাদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার কথা। এমন সময় সেই চালা ঘরটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে বলল, আপনারা কি "পলিয়া বাক্স" নিতে এসেছেন? দিদিমণি অনেকক্ষণ আগে আমার কাছে রেখে গেছেন। ধড়ে প্রাণ এল। সেই মহার্ঘ বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলাম।

এরপর আবার অন্য এক ব্লকে দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলাম। নিজের চোখের ডাক্তারী ভোলানোর জন্য ওসব দায়িত্ব একেবারে আদর্শ। নিজের দায়ে খুঁজে খুঁজে চোখের ক্যাম্পে চলে যেতাম। একটা প্রত্যন্ত গ্রামে একটা ক্যাম্প হবে; একজন গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার মত লোক ডেকে গেছেন। ওনারই আসার কথা , আমাকে নিতে। দুপুরের আগে দেখি জেলার বড় কর্তা এসে হাজির। আমাকে বললেন, চলো আমার গাড়িতে, তোমার তো চোখের কাম্পে যাওয়ার কথা। এত অবাক হয়েছিলাম যে , কোন কথা জিজ্ঞেস করার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। উঠে বসলাম স্যারের গাড়িতে। মিনিট পাঁচেক

চলার পর, গাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের রাস্তা ধরল। গরুর গাড়ী চলার মত কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ী চলছে তো চলছেই। দূরে দূরে হলুদ সর্ষে ফুল ভরা মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।সেই হলুদ প্রান্তর পেরিয়ে এক সময় একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। খুব বেশী রুগীও ছিল না। আমি যতক্ষণ রুগী দেখছিলাম, বড় সাহেব চুপ করে বসে থাকলেন। কেন যে গেছিলেন, আজও আমি জানি না। দুর্জনে অনেক কথা বলে; যে মানুষটা প্রয়াত হয়েছেন, তার সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চাই না।

শেষ করি আর এক বড় সাহেবের গল্প বলে। কোলকাতা থেকে একটু দূরের এক জেলার বড় সাহেব আমার সেই বন্ধু। জেলাটি বেশ একটা বেড়ানোর জায়গা। এক শীতকালে বন্ধু বললেন, চলে এস বাড়ীর সকলকে নিয়ে। এক শীতের ভোরে উঠে বসলাম রেলগাড়িতে। ওরা আমাদের পুরনো পারিবারিক বন্ধু। দুপুরে পৌঁছে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরলাম দর্শনীয় স্থানের কিছু দেখে নিতে।

প্রায় শহরের ভেতরে ভেতরেই কয়েকটা দর্শনীয় স্থানে ঘুরে নিলাম। পরদিন একটু সকাল সকাল বেরনো হল , একটু দূরের কয়েকটা জায়গা দেখার জন্য। গাড়িতে শহর ছাড়িয়ে বেরতেই দেখি সেই হলুদ সর্ষে ফুল ভরা মাঠের পর মাঠ। একটা জায়গায় গাড়ী থেকে নেমে মাঠে চলে গেলাম এখানে কিন্তু কাছে গিয়েও দেখলাম, বেশ ঘন সর্ষে ফুল। এত সুন্দর ফুলের কাছে গেলে ছবি তুলতে ইচ্ছে করেই। কয়েকটা ছবি তোলাও হল। তারপর চললাম আমাদের গন্তব্যে।

বেশ কিছু ঐতিহাসিক সৌধ দেখার পর মনে পড়ল, এদিকেই আছে আমাদের কুলদেবতার একটা বড় আশ্রম। ড্রাইভারকে বলতেই নিয়ে গেলেন। রাস্তার উপরেই বড় সিংহ দরজা। ভেতরে অনেক জায়গা নিয়ে মন্দির আর আশ্রম। মন্দিরের পাশে বেশ বড় মাঠে ফুটে আছে হলুদ সর্ষে ফুল।

চাকরী করতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় গিয়ে ভালো করে জানলাম যে দক্ষিন দিনাজপুর বলে আর একটা জেলা থাকলেও পশ্চিম দিনাজপুর বলে আর কোন জেলা নেই। আরও জানলাম দক্ষিন দিনাজপুরের একটা বড় জায়গার নাম গঙ্গারামপুর। সেখানকার দই খুব বিখ্যাত শুনলেও খেয়ে দেখা হয়নি। অবশ্য অনেকবারই গিয়েছি গঙ্গারামপুর। একবার ওই গঙ্গারামপুর থেকে বাসে ফেরার সময় দেখি একটা হলুদ সর্ষে ফুলে ভরা প্রান্তরের মাঝে অনেক মৌমাছি পালনের বাক্স রাখা আছে। এই ব্যাপারটা জানা ছিল না। আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের বাড়ীতে এক সময় এরকম একটা মৌমাছি পালনের বাক্স ছিল । আমের মুকুলের সময় আর জাম গাছে ফুলের সময় খুব মধু হত। কিন্তু সর্ষে ফুলের মধুর কথা জানতাম না। জানলাম এই বাক্সগুলি ট্রাকে নিয়ে এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেরায়। আমের সময় আম বাগানে, লিচুর সময় লিচু বাগানে বাক্সগুলি নামিয়ে রেখে ,মৌমাছিদের মধু সংগ্রহ করতে কাজে লাগায়।

অশোকনগরের গ্রাম, ৮.১.২৫.

বাঁকুড়া আমার খুব প্রিয় জেলা। জীবনের খুব সুন্দর একটা অধ্যায় ওখানে কেটেছে। আজও সময় সুযোগ হলে চলে যাই বাঁকুড়ায়। সেরকম সর্ষে ফুল ভরা মাঠ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কদিন আগেই আমার কলেজের এক দাদার বাঁকুড়া ভ্রমণের গল্প আর কিছু ছবি দেখছিলাম। তাই দেখেই মনে হল আমার সর্ষে ফুল দেখার অভিজ্ঞতা লিখেই রাখি। সামান্য কিছু ঘোরা ঘুরি করেছি আমরাও। তাই বলে একেবারে পায়ের তলায় সর্ষে বলার মত ঘোরা হয়নি। কিন্তু চোখে সর্ষে ফুল দেখার মত ঘটনা তেমন না ঘটলেও, আজও চোখ বন্ধ করে অনেক সর্ষে ফুল ভরা মাঠের ছবি দেখতে পারি। ৮.১.২১.

সস্তা

সস্তা বললেই আমাদের মনে একটা কেমন অবজ্ঞার ভাব আসে। আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রায় সবাই দেখেছি, এই একটি ব্যাপারে একমত। সস্তা জিনিস ভালো হতেই পারে না। আর কদিন পরই হুগলী , মেদিনীপুর আর বর্ধমানে আলু এত সস্তা হয়ে যাবে যে, মাঠেই পড়ে থাকবে। কোন ফড়ে যদি দয়া করে তুলে নিয়ে যায়, চাষি বেঁচে যায়। মাঠে যে আলু তিন টাকা দামে বিক্রি হবে, সেটাই মাস ছয়েক পর আমরা পঞ্চাশ টাকায় কিনব। এমন একশ একটা উদাহরণ আছে। বাঁকুড়ার গ্রামের চাষি বাদামী বা কালো চাল চাষ করে বাজার পায় না। ঐ কালো চাল , কলকাতার মলে তিনশ টাকা কেজি দরেও পাওয়া যাবে না। ডুয়ার্সের চা সস্তা বলে দার্জিলিং চায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এই ডুয়ার্সের চা ভারত বিখ্যাত কোম্পানির মোড়কে বাজারে এলে আমরা খুশি মনে কিনি।

আমার এক ডাক্তার ভাই কোলকাতার বাড়িতে একটা নেড়ি কুকুর পুষেছে দেখে খুব ভালো লাগে। বিদেশী কুকুরের ছানা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে না কিনলে মান থাকে না। অথচ এই একটা নেড়ি কুকুর চটকেল আমাদের গ্রামের বাড়িতে চন্দ্রবোড়া সাপ আটকে হিরো হয়ে গেছে। এই নেড়ীরা যে কত অভাগার মত থাকে ভাবা যায় না। বাড়ীর এটোকাঁটা খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়।

ছোটকেল

পাড়ার যুগলের সেলুনে তিরিশ টাকা দিয়ে চুল কাটালে মান থাকে না; ভারতজোড়া ছড়িয়ে থাকা হেয়ার স্টাইল ডিজাইনার- এর কাছে তিনশ টাকায় চুল কেটেছি বললে বন্ধু মহলে বেশ মান বাড়ে। এসব দেখেই যুগলরাও এখন নতুন নতুন ছক বের করছে, চুল কাটতে গেলে ম্যাসাজ, মুখে সাবান, চুলে রং এসব করে একটু পয়সা করছে। বাড়িতে একটা দাড়ি কাটার সরঞ্জাম রাখলেই সবদিন নিজেই দাড়ি কামানো যায়; তবু দেখি সব সেলুনেই দাড়ি কামানোর লোকের লাইন। সেলুনে দাড়ি কামাতে গিয়ে কতো মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে, এসব কি লোকে জানে না?

বাজার থেকে সবথেকে ভালো কাপড় কিনে, ভালো দর্জি দিয়ে প্যান্ট বানিয়ে দেখেছি, ভারত বিখ্যাত কোম্পানির ঝাঁ চকচকে দোকানের প্যান্টের চার ভাগের এক ভাগ দাম পড়ছে। কিন্তু ঐ চারগুণ দামের দোকানের প্যান্টটি না পরলে মান থাকে না।

আমি তিরিশ বছর আগে মেদিনীপুর শহরে কুড়ি টাকা ফি নিয়ে রুগী দেখতাম। একজনকে একটা চোখের ড্রপ লিখে দিলাম। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে বলল, মাত্র সাড়ে তিন টাকার ওষুধে কাজ হবে? বুঝিয়ে পারলাম না। আমার কাছেই একজন পুরনো ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়ে ঢুকল দেখলাম। আমার কিছু শিক্ষা হল। সেই শিক্ষা কদিন পরেই চশমার ব্যবসায়ীকে শেখালাম। বেচারা বি কম পাশ করে বেকার বসে ছিল; আমার চেম্বারের সামনে গোটা তিরিশেক চশমার ফ্রেম নিয়ে বসে থাকত। একদিন জানতে চাইলাম, তোমার এসব ফ্রেমের দাম কত? বলল, কুড়ি -বাইশ টাকা। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মেদিনীপুর শহরে তখন ওসব ফ্রেম ষাট সত্তর টাকায় বিকোয়। ওকে বললাম, এত সস্তা দাম বললে লোকে ভরসা পাবে না, ভাববে কোন নকল জিনিস। তুমি অন্তত একান্ন টাকা দাম বলবে, লোকে দরাদরি করলে এক টাকা দাম কমিয়ে দেবে। তিরিশ বছর পর আমার সেই বন্ধুর দোকানে এখন পাঁচ জন কর্মচারী।

লোককে আর কি বলব; আমার নিজের একটা চোখের ছানি অপারেশন হল। ভারত বিখ্যাত হাসপাতালে ওদের সবথেকে দামী অপারেশন করালাম। চশমা না পরলে তিন লাইনের বেশী দেখি না। আমি নিজেই এক মহিলার চোখের ছানী অপারেশন করেছিলাম, হাসপাতালে, আমার অপারেশন এর মাস দেড়েক আগে। সাধারনত অপারেশন এর মাস খানেক পর এদের চশমা নিতে ডাকা থাকে। এই মহিলা আসেননি। আমার নিজের অপারেশন -এর মাস দুই পরে একদিন এলেন। বললাম, এত দেরী করে এলেন কেন? চশমা নিতে ডেকেছিলাম না? মহিলা বেশ জোর দিয়ে বলেন, চশমা কেন নেব? আমি তো সবই দেখতে পাচ্ছি! নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পড়তে বললাম; একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত পড়ে দিলেন। অথচ ওনার চোখে সরকারী হাসপাতালের সস্তা লেন্স লাগিয়েছি।

আমার বন্ধু ডা গুন, ডা ভট্টাচার্য, আমাদের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডা পি কে সরকার স্যর খুব সস্তা ওষুধ দিয়ে, সব রকম রুগীর চিকিৎসা করেন। এই ওষুধগুলো জেনেরিক ওষুধ বলে পরিচিত। বাজারে নামী কোম্পানির একই ওষুধ দশগুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এত সস্তা ওষুধে কাজ হবে কি না, এমন সন্দেহ থেকেই যায়। কিন্তু যে তিনজন ডাক্তার বাবুর কথা বললাম, ওনারা তো তিরিশ বছর বা তারও বেশিদিন ধরে এই সস্তা ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। রুগীর রোগ না সারলে ওনাদের কাছে যাচ্ছে কেন?

সস্তা,আসলে বিনা পয়সার সরকারী হাসপাতাল সম্বন্ধে বাঙালী মধ্যবিত্তের সাংঘাতিক উন্নাসিকতা । এই করোনা অতিমারীতেই দেখলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বাস্থ্য অধীকর্তা নিজে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুস্থ হলেন ; তবুও লোকে পাঁচতারা বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে উনিশ লাখ টাকা খরচ করলেন । একজন বিদুষী মহিলার সাথে আমার তর্কাতর্কি হয়ে গেল । তাঁর মতে ,"ভদ্রলোকেরা সরকারী হাসপাতালে যায় না" ! তাহলে যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন সরকারী হাসপাতালে গিয়ে লাইন দিচ্ছেন , তাঁরা সবাই কি " ছোট লোক " ? এ কথা বলায় চটে গেলেন । আসলে মধ্যবিত্তের এই মানসিক বাধাটি কোনদিনই যাবে না।

এই সস্তা যে কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক বাধা বা মেন্টাল ব্লক, এটা প্রায় সর্বজনিন। আমি আমার খুব পরিচিত দোকানে কয়েকটা জিনিস কেনার পর জানতে চাইলাম , বিরীয়ানিতে দেওয়ার গোলাপ জল আছে কি না ;তাক থেকে একটা মাঝারী সাইজের বোতল বের করে বলল ,দশ টাকা। চমকে গেলাম ; এত সস্তা? দোকানদার বলল, একই জিনিস অন্য দোকানে কুড়ি টাকা। কিনে তো আনলাম; ও জিনিস খাওয়ার সাহস হল না। এই বস্তু তো হাজার হাজার লোক খাচ্ছে। আমার মেয়ে একটা কালো রঙের সেলাই-এর সুতো কিনতে বলেছিল। দোকানে যাওয়ার সময় একটা দু'শো টাকার নোট আর দু'টি দশ টাকার নোট নিয়ে বেরোলাম। দোকানে একটা কালো সুতো দিতে বললাম; দোকানদার বললেন, চার টাকা। বুঝলাম , দশ টাকার নোট দিলেও বিরক্ত হবে। দু টো দিতে বললাম । এত কম দামে কি করে এ জিনিস দিচ্ছে ভেবে পেলাম না। ঐ সুতোর সস্তা দাম থেকেই এই

“ সস্তা” লেখাটা মাথায় এল । সত্যিই কি সস্তার তিন অবস্থা ? আসলে আমাদের এই মানসিক বাধাই অসাধু ব্যবসায়ীদের মূলধন।

সাদা চামড়ার লোক

দু হাজার সাত সাল থেকে সাপের কামড় নিয়ে কাজ করছি। সম্ভবত দু'হাজার নয় কি দশ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাপের কামড় বিশেষজ্ঞ , অক্সফোর্ড এর অধ্যাপক, ডেভিড ওয়ারেল সাহেবের সাথে ই -মেলে যোগাযোগ শুরু। তারপর থেকেই আমাদের এই সাপের কামড় নিয়ে কাজের সূত্রে যোগাযোগটা থেকেই গেছে। ঐ রকম বিশাল পন্ডিত, ঐ রকম ব্যস্ত মানুষ যে আমার মত সামান্য একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছেন, এটাই আশ্চর্য হাওয়ার মত ব্যাপার। আগে একটা নিবন্ধে লিখেছিলাম, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের বাড়িতে দু'জন আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন। তখন একটা কথা খুব চালু ছিল, "সি আই এর চর"! আমরা অবশ্য সেই প্রাইমারী স্কুলে পড়ার বয়সে, ঐ চর জিনিসটা ঠিক খায় না মাথায় দেয় , কিছুই জানতাম না। আবার এটাও ঠিক যে, ঐ দুই সাহেব কি জন্য এদেশে এসেছিল, বা কি জন্য মেদিনীপুরের ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিল, আমরা আজও কিছুই জানতে পারিনি। পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবী আর আজকের পৃথিবী এক নয়।

এখন একজন বিদেশী যে কোন দেশে ঢুকলেই তার কোষ্ঠী ঠিকুজি নতুন দেশের প্রশাসনের কাছে চলে আসে। আর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে কোন বিশেষজ্ঞের কোষ্ঠী ঠিকুজি ইন্টারনেট থেকে বের করতে মিনিট তিনেক বা তারও কম সময় লাগে। অবশ্যই জানার সদিচ্ছাটা থাকে যদি। আর যদি এঁড়ে তর্ক করার জন্য নিজের গোঁ ধরে রাখতে চাই, তাহলে বলতে পারি, নিজের বাবা -দাদাকে কি আমরা ভালো করে চিনি সবাই?

আমার এক বিশ্ব বিখ্যাত পন্ডিত শুভানুধ্যায়ী আমাকে একটু কটু ভাবেই বলেছিলেন, " এসব সাদা চামড়ার লোকেদের সাথে মুখ শোকাশুকি ভালো নয়!" সেই শুভানুধ্যায়ী দাদা নিজে অবশ্য সাদা চামড়ার দেশেই পড়ে আছেন, অন্তত বছর তিরিশ। হতে পারে , উনি আমার থেকে হাজার গুণ বেশী সাদা চামড়ার লোকেদের দেখেছেন, তাদের কাছে ঠকেছেন, তাই আজ এসব কথা বলতে পারছেন। কিন্তু ওনার সাথে সাহেবদের সম্পর্ক আর আমার সাথে ওয়ারেল সাহেবের সম্পর্ক একেবারেই আলাদা। আমার সেই শুভানুধ্যায়ী দাদা, সাহেবদের দেশে গিয়ে, তাদের সাথে পেশাগত প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। আর আমার সাথে এই সাহেবের সম্পর্ক ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক।

এই প্রোফেসর ওয়ারেল সাহেবের কাজটা কি একটু জানা দরকার। উনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক। ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগ যে সকল রোগ নিয়ে কাজ করে, সেগুলি মূলত আমাদের দেশের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অসুখ। ইংল্যান্ড আমেরিকার মত শীতের দেশে সে সকল রোগ হয়না বললেই চলে। তবুও ঐ শীতের দেশের একটা পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও এসব অসুখ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা আর চর্চা কেন হয়? এর অনেকগুলি কারণ আছে বা থাকতে পারে। নিন্দুকেরা বলবেন, এক সময় আমাদের দেশের মত বহু গরমের দেশ, ঐ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তাই তারা এসব রোগ নিয়ে চর্চা করতেন। আর আজকের পৃথিবী

শাসন করে অর্থনীতি' এটা বোধহয় যে কোন মাধ্যমিক পাশ ছাত্রও জানে। ওষুধ ব্যবসা এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের একটা বড় অস্ত্র, এটাও আজ আর গোপন রাখার মত ব্যাপার নয়। হতে পারে, আমাদের পুরনো প্রভুরা সুক্ষ্ম কৌশলে, এখনও আমাদের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই আমাদের দেশের রোগ স্বালা নিয়ে এখনও চর্চা করে যাচ্ছেন। আমরা যারা এখনও ,"সব থেকে অবহেলিত গ্রীষ্মের দেশের অসুখ" , সাপের কামড় নিয়ে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি, তারা জানি, এই ট্রপিক্যাল ডিজিজের মধ্যে," মোষ্ট নেগলেক্ট " অসুখ নিয়ে কাজ করা, গবেষণা করা তো দূরের কথা; সভা সমিতিতে এ নিয়ে একটু আলোচনা করাও কতো কঠিন।

এই দেশে সরকারী হিসেবেই বছরে আটান্ন হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান, গত প্রায় কুড়ি বছর ধরেই এটা চলছে। আর ,আমরা যারা এই নিয়ে কিছু খবর রাখি, আমরা জানি, এই মৃত্যুর সংখ্যাটা দু- তিন লাখ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের বাদামী সাহেবদেরই ভীষন উন্নাসিক ভাব। বাদামী সাহেব বলতে কাদের কথা বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বিশদে বলার দরকার নেই। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের হাজারে একজনও এই সাপের কামড় নিয়ে ভেবে "বাজে সময় নষ্ট" করতে চাননা। তারা গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঁচ হাজার টাকা দামের সাপে কাটার অ্যান্টি ভেনম দেওয়ার থেকেও বেশী জরুরী মনে করেন, সব হাসপাতালে কোটি টাকার এম আর আই মেশিন থাকা।

এই বাদামী সাহেবরাই আজ দেশ চালাচ্ছে। আমি যেহেতু জন্মেছি, সাদা চামড়ার সাহেবরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর পরে, তাই তারা কেমন ছিল, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু বই পত্র পড়ে যা বুঝেছি, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বহু বহু উদাহরণ আছে। আমি শুধু আমার চেনা এই অধ্যাপক সাহেবের কথাই বলছি। একটা কনফারেন্স -এ এই সাহেবকে আনতে হলে, বছর দেড়েক আগে থেকে দিন ক্ষণ ঠিক করে জানাতে হয়, এতোই ব্যস্ত মানুষ। সারা বছরই গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বছর পাঁচেক আগে , এ দেশে গোটা তিনেক জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রন নিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতায় আসার আগে দিল্লিতে গেছিলেন। ওখানে আমাদের দেশের এক বাদামী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, 'সাপের কামড়' -এর সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলেন। বেশ কটু কথা শুনে এসেছেন। গোটা পৃথিবীর কাছে মান সম্মান পাওয়া একজন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মানুষ, তার ছেলের বয়সী আমার কাছে যেটুকু বলা সম্ভব, সেটুকুই বলেছেন। আমি যা বুঝেছি সেটা হল, আমাদের দিল্লির বাদামী সাহেব ওনাকে বলেছেন, " সাপের কামড় আমাদের দেশে কোন সমস্যাই নয়, আপনারা বিদেশী লোকের এটা নিয়ে বেশী মাতামাতি করছেন!" ঐ বিশাল পন্ডিত মানুষটির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। আর আমাদের বাদামী সাহেবরা যে এভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত সেটা আমাদের জানা আছে। সেই ঘটনার বছর দুই- আড়াই পরে, আমাদের মুম্বই- এর এক সহযোদ্ধা মহিলা, দিল্লির ঐ রকম এক বাদামী সাহেবের সাথে দেখা করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। একেও প্রায় একই রকম কড়া কথা শুনে আসতে হয়েছে। সচিব স্তরের সেই মহিলা বলেছিলেন, "দেশের সব জেলা হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসা হয়, আপনারা আর কি চান?" আমাদের পশ্চিম বাংলার সবকটা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই সাপের কামড়ের চিকিৎসা হয়, এখানকার মানুষ ভাবতেই পারবে না যে, বিহার, উত্তর প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে এক একটা জেলা হাসপাতাল থেকে দুশো আড়াইশ কিমি দূরের গ্রামের মানুষকে সাপে কামড়ালে তাদের কি দুর্দশা হয়। শুনতে হতাশাজনক লাগলেও এটাই গ্রামীণ ভারতের বাস্তব চিত্র। আমার কেরালার বন্ধু ডা জীবন কুরুভিল্লা ছত্রিশগড়ের এক প্রত্যন্ত

গ্রামে, একটি মিশনারী হাসপাতালে কাজ করছেন। ওদের হাসপতালের দু'শো কিলোমিটারের মধ্যে কোন শহর নেই। এই মিশনারী হাসপতালের কথা বলতে গিয়েই মনে এল এক খৃষ্টান মিশনারী সাহেবের কথা।

বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের দ্বিতীয় প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, রেভারেন্ড এ ই ব্রাউন সাহেব। এদের আমরা এখনও খৃষ্টান পাদ্রী বললেই ভালো চিনি। এই পাদ্রীদের ইতিহাস যেটুকু জানি, তাতে মনে হয় , এনাদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। ধর্ম প্রচার যে কোন শাসকই করতে পারেন; বা বলা ভাল করেছেন। আমাদের দেশের মহান সম্রাট অশোকও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন। তারপর মুঘল সম্রারাও ধর্ম প্রচার করেছেন। এক এক জন শাসকের কাজের ধারা এক এক রকম। আজ কয়েকশ বছর পর, নিরাপদ দূরত্বে বসে তাদের কাজ কর্মের সমালোচনা, পর্যালোচনা খুব সহজ। আমি ঐ ব্যাপক তর্ক বিতর্ক যোগ্য ব্যাপারের মধ্যে আর যেতে চাই না। ইংরেজ সরকার কি উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার মত প্রত্যন্ত জেলায় ওরকম বড় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তার খবরে আজ আর আমাদের কিছুই আসে যায় না।

কিন্তু এই কলেজটি যে বাঁকুড়া সহ আশপাশের কয়েকটি জেলার মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বিশাল ভূমিকা পালন করে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার নিজের গ্রাম মেদিনীপুর জেলার (সংযুক্ত) এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আমাদের গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত বাজে ছিল, উনিশশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত। আমার বাবা আঠারো কিলো মিটার রাস্তা হেঁটে পাঁশকুড়া স্টেশনে এসে রেল গাড়িতে উঠতেন। আমি নিজেই ঐ পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত ,পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসে, লোয়াদা বাজার থেকে বাস ধরে শহরের দিকে গিয়েছি।সেই প্রত্যন্ত গ্রামের থেকে , অধুনা প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কিশোরী মোহন মন্ডল মশাই বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। সে আজ থেকে একশ বছর আগে । আমি শুনেছি, আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী বাবু , আমাদের ডেবরা থানার প্রথম স্নাতক ছিলেন। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, পোষ্ট আপিস সবই ঐ কিশোরীবাবুর উদ্দোগে তৈরী। আমার গ্রামে শিক্ষার প্রসারের উৎস যে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ , এটা আমার গ্রামের নিরানব্বই শতাংশ মানুষই জানেন না।

একই ভাবে, আমার কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনেও যে ঐ রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বেশ কিছু অবদান আছে, সেকথা আমি জানলাম, কলেজ থেকে পাশ করে আসার আটত্রিশ বছর পর। আমি বাঁকুড়ায় থাকার সময় ঐ বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ বাইরে থেকে দেখেছি। আমরা ওখানে যাওয়ার আগে , ঐ খ্রীষ্টান কলেজ –এ প্রিমেডিক্যাল এক বছর পড়ানো হত। ঐ কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নাম " ব্রাউন হোষ্টেল" , এটুকুই জানতাম তখন । কে ব্রাউন সাহেব, বা কোনটা তাঁর নামাঙ্কিত ছাত্রাবাস কিছুই জানা ছিল না। মাত্রই বছর দুই আগে (২০১৯ সালে) একবার বাঁকুড়ায় গিয়ে , বাইরে থেকে ঐ ছাত্রাবাসটি দেখে এসেছি।

এই ছাত্রাবাসটি দেখতে যাওয়ার পিছনেও একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। আমি জানিনা, আজও বাঁকুড়া জেলার কজন জানেন , ওখানকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনেও যে ঐ রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বেশ কিছু অবদান আছে। তার থেকেও চিত্তাকর্শক একটি ইতিহাস আছে , ঐ সাহেব আর তাঁর সন্তানদের নিয়ে। রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের কন্যা এবং পুত্র বাঁকুড়াতেই জন্মেছিলেন। সে আজ থেকে একশ পাঁচ বছর কি তারও বেশী পুরনো খবর।এখন নেটে খুঁজলেই দেখা যায় , ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে সোনার পদক জয়ী গডফ্রে ব্রাউন আর রুপোর পদক জয়ী অড্রে ব্রাউনের জন্মস্থান লেখা আছে , ভারতের বাঁকুড়া। সেই ১৯১১ সাল ,যে

বছর দেশীয় দল মোহনবাগান, সাহেবদের দলকে ফুটবল খেলায় হারিয়ে দিয়ে ইতিহাস গড়েছিল, সে বছরই রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসা। উনি বাঁকুড়ায় ছিলেন ১৯২৭ সাল পর্যন্ত।

বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯১২-১৩ সালে বাঁকুড়ায় সম্মিলনী নামে একটি সংস্থা তৈরী হয়। বাঁকুড়ার বেশ কিছু মহান ব্যক্তির সাথে এই ব্রাউন সাহেবও ছিলেন ঐ সংস্থার সাথে। প্রবাসী সম্পাদক ও বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামও দেখছি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে। ১৯২২ সালে তৈরী হল বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল। অর্থাৎ ,সামনের বছর তার শতবার্ষিকী। এখনকার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছের মালিয়াড়া গ্রাম তখন ছিল বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঐ গ্রামের মানুষ , দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় তখন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারক হয়েছেন। উনিও সম্মিলনী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মালিয়াড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবতোষ বটব্যাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডা উত্তম কুমার বটব্যাল আমার কলেজের দাদা। বাড়ীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মূল্যবান ঐতিহ্যকে , উত্তমদা নিজের বলিষ্ঠ লেখনিতে ধরে রাখছেন। ওনার লেখা থেকেই জানতে পারি,বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ব্রাউন সাহেবও ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। এমন কি মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম শব ব্যবচ্ছেদের সাথেও ব্রাউন সাহেবের নাম জড়িয়ে আছে।

এই সাদা চামড়ার ব্রাউন সাহেবের অবদানের সাথে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব , ভগিনী নিবেদিতার অবদানের তুলনা করেছেন,স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রনম্য ভবতোষ বটব্যাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। হেয়ার-নিবেদিতা-ব্রাউন সাহেবরা ইতিহাসে চলে গেছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় ওয়ারেল সাহেবকে দেখছি। এনার অবদান আজ আমার দুর্ভাগা দেশ বুঝতে পারছে না। আগামী প্রজন্ম এনাদের কথা মনে করবে, এইটুকুই আশা করতে পারি। অবশ্যই সে ইতিহাস পড়ার জন্য এই অধমও তখন এ জগতে থাকবে না।(৫.৬.২০২১)

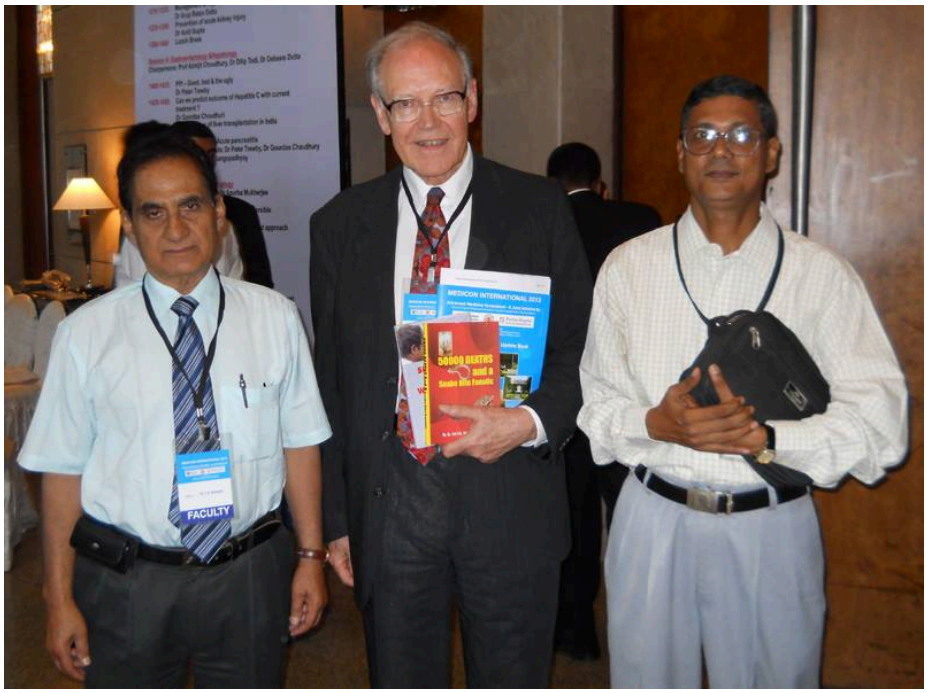

ওয়ারেল স্যারের সাথে, কোলকাতায়

সাপের কামড় - কি করনীয় ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

সাপের কামড় নিয়ে গত এগারো বছরে অসংখ্য আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণের ক্লাশে বলা, জনসচেতনতা ইত্যাদি করতে গিয়ে দেখেছি, এই বিষয়টি প্রায় সর্বস্তরের মানুষজনের কাছে এখনও পরিস্কার নয়। এই স্বচ্ছ ধারণার অভাবটা কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক, নতুন পাশকরা ডাক্তারবাবু, উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারি, শিক্ষক, ছাত্র, আপামর জনগন সবার ভেতরেই দেখেছি। এমনকি বিজ্ঞান আন্দোলন করা লোকজনও এর মধ্যে পড়েন।

ক'মাস আগেই একটা ক্লাশে স্কুলের শিক্ষক আর কয়েকজন বিদ্যালয় পরিদর্শককে এই সাপের কামড় নিয়ে বলছিলাম। একজন শিক্ষক বলছিলেন যে, ওনারা অনেক বছর ধরে বিজ্ঞান আন্দোলন করছেন, সাপের কামড়ের বিষয়ে সচেতনতার কাজও তার মধ্যে আছে। উনি এক ঘন্টার ঐ ক্লাশের শেষে নিজেই বললেন যে, এতদিন অনেক ভ্রান্ত ধারনা ছিল। আমরাও গত বেশ কয়েক বছর এই সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, সাধারন তো বটেই, শিক্ষিত লোকজনের বহুযুগ ধরে জেনে আসা ভ্রান্ত ধারনা কাটিয়ে, চিকিৎসা করাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্যই সাপে কামড়ালে কি করব আর কি করব না, এ নিয়ে বলতে হলে, প্রথমেই বলি যে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ধারনাগুলি নিয়ে বসে থাকবেন না। যেটা করতে হবে, তার প্রথম পদক্ষেপটিই হল, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু যে চিকিৎসাটা করতে চাইছেন, সেটা করতে দিন। আপনার রুগীকে সুস্থ করে তোলাটাই যে কোন চিকিৎসকের প্রথম লক্ষ্য। আপনার রুগীর ক্ষতি করার জন্য কোন ডাক্তারবাবু কোন পুরস্কারও পাবেন না।

এবার এক এক করে বলি কাউকে সাপে কামড়ালে কি করবেন, আর কি করা যাবেনা। কাউকে বা আপনাকে নিজেকেই যদি সাপ বা অজানা কিছু কামড়েছে মনে হয়; আশেপাশের কাউকে ডেকে ব্যাপারটা জানান। অন্ধকারে থাকলে, তাড়াতাড়ি একটা টর্চ আনতে বলুন। যাকে কামড়েছে, উনি স্থির হয়ে বসে থাকবেন। অন্যরা এক দু মিনিট আশেপাশের জায়গায় কোন সাপ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করবেন। সাপ খোঁজা বা মেরে ধরে আনার জন্য সময় নষ্ট করবেন না।

এখানে বলে রাখি, এখনকার চিকিৎসাটা পদ্ধতিতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য সাপ চেনার কোন দরকার নেই। যে সাপেই কামড়াক, চিকিৎসা হয়, রোগ লক্ষণ দেখে। এজন্য সাপটিকে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট না করাই ভালো। সাপ যদি দেখতে পান, যদি কোন সর্পবিদ উপস্থিত থাকেন, তাঁর কাছে জেনেনিন সাপটির সঠিক পরিচয়। সাপ মেরে বা ধরে, কখনই হাসপাতালে আনবেন না। অনেক সময়ই তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা, "বাঁধন দেওয়ার" কোন দরকার নেই। বাঁধনে বিষ আটকায় না। এতেও হিতে বিপরীত হয়েছে অনেক সময়।

কামড়ের জায়গায় কোন রকম ধোওয়া বা ওষুধপত্র দিয়ে পরিস্কার করার দরকার নেই। কুকুরের কামড়ে জায়গাটা ভালোকরে সাবান দিয়ে ধুতে বলা হয়। তার থেকেই ভ্রান্ত ধারনা তৈরী হয়েছে যে, সাপ কামড়েও বোধহয় ধুয়ে দিতে হয়; এটা একেবারে ভুল ধারণা। ধোওয়া বা ঘসাঘসি করলে বিষ আরও দ্রুত ছড়িয়ে যায়। হাতে কামড় হলে, তাড়াতাড়ি ঐ হাতের আংটি, চুড়ি, বালা ইত্যাদিকে খুলে ফেলুন। একটু পরেই হাত বা আঙুল ফুলে উঠলে ঐ সব গয়না কেটে বসতে পারে। যদি সম্ভব হয়; (আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানোর সময় এটা করে ভালো ফল পেয়েছি), হাসপাতালের কাউকে ফোনে জানিয়ে রাখুন যে, একজন সাপকামড়ের রুগী ওখানে যাচ্ছে।

যদি খুব কাছাকাছি আম্বুলেন্স থাকে, ডেকে নিন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে আম্বুলেন্সের জন্য দেরী না করে, মোটর বাইকে আহতকে বসিয়ে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে রওনা দিন।

এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারটি সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারনা পরিস্কার নয়। প্রথম কথা হল, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার থাকতে হবে। ওখানে রুগী ভর্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানে ঐ দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা সেখানে হবেই। অন্য যে কোন রোগের ক্ষেত্রে, শহরের বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালো থাকতে পারে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাই সব সময় ভালো। কারন, সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মিনিট গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বড় হাসপাতালে যেতে যদি পনের মিনিট বেশী লাগে, সেটাই প্রাণঘাতী হতেপারে। অবশ্য যদি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বর্ধমানের মত গ্রামীণ মেডিক্যাল কলেজের দু চার কিমির মধ্যে সাপে কামড়ায়, সেক্ষেত্রে ঐসব হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি পৌছন সম্ভব।

আর একটা বিষয় নিয়ে সাবধান করা খুব জরুরী। কোন অবস্থায়ই আহত ব্যক্তি নিজে সাইকেল বা মোটর বাইকে রওনা দেবেন না। প্রথম অবস্থায় শরীর বশে থাকলেও, কোন কোন সাপের কামড়ের পর , পনের কুড়ি মিনিটেই হাত পা অবশ হয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে বাজে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সাইকেল চালানোর মত শরীর চালনার কাজে শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়, তাতে বিষও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আমাকে প্রায়শঃই একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা কি? উত্তরটা হল, প্রচলিত অর্থে, সাপের কামড়ের কোন প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। কামড়ের পর, আহতকে আতঙ্কগ্রস্ত না করে, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই একমাত্র কাজ।

কি কি করবেন না, সেই তালিকায় আর দুই একটা জিনিস জানিয়ে রাখি। কেটে চিরে বা বিষপাথর ইত্যাদি দিয়ে বিষ বেরকরার কোন চেষ্টাই করবেন না। কামড়ের জায়গায় কোন রকম ছোপ বা গাছগাছড়ার প্রয়োগ করবেন না। কোনরকম অনুপান বা টোটকা ওষুধ খাওয়াবেন না। কোন ওঝা গুণীন জাতীয় লোকের কাছে নিয়ে গিয়ে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কারও কোন পরামর্শে কান দেবেন না। এমনকি হাসপাতালের অ-ডাক্তার কর্মচারিও আপনাকে বিপথে চালিয়ে বিপদ বাড়াতে পারে।

প্রাথমিক আন্টিভেনম ইত্যাদির প্রয়োগের পর ডাক্তারবাবুদের যদি মনে হয় কোন উচ্চতর হাসপাতালের বিশেষ চিকিৎসার জন্য রুগীকে শহরে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে তাঁর লিখিত রেফার লেটার নিয়েই রওনা দেবেন। ওটি না নিয়ে গেলে, পরের হাসপাতালে চিকিৎসা বিভ্রাট হতেপারে। সাপেকাটা রুগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময়, বাড়ীর বা সাথের লোকের নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ আছে। খেয়াল রাখবেন, রুগী যেন বেশী নড়াচড়া না করে। হাঁটা বা দৌড়ান একেবারেই চলবে না।

কামড়ের জায়গায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, ভালোকরে লক্ষ করে চলুন; চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবু ঐ জিনিষগুলি জানতে চাইবেন। যেমন, কামড়ের জায়গা থেকে রক্ত বেরচ্ছিল কি না, জায়গাটা ক্রমশ ফুলে যাচ্ছে কি না, কামড়ের জায়গার আশপাশের চামড়ার রং পাল্টে গেল কি না।

এছাড়া রাস্তায় যাওয়ার সময় রুগীর মনোবল বাড়ানোর জন্য তাকে আশ্বস্ত করে কথা বলতে বলতে চলুন। রুগী কি কি কষ্টের কথা বলছিল, বা কতক্ষণ আগে পর্যন্ত কথা বলছিল, এগুলিও সঠিক চিকিৎসার জন্য জরুরী। অনেক সময়ই হাসপাতালে পৌছনোর আগেই রুগী কথা বলার ক্ষমতা হারায়; সেক্ষেত্রে সঙ্গের লোকজনের বলা কথা শুনেই চিকিৎসা করতে হয়।

সাপে কামড়ালে কি করবেন? এক কথায় উত্তর, যতো দ্রুত সম্ভব রুগীকে সবথেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে চলুন। আর কি করবেন না? ওঝা গুণীনের বাড়ী যাবেন না, একথা সবাই বলবে। আমি বলি, শহরের বড় হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না।

আমাদের গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কালাচ বা কালাচিতি সাপের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রেই সমস্যা হয় সবথেকে বেশী। এই সাপটি অত্যন্ত রহস্যময়। সাধারনত রাত্রে , খোলা বিছানায় এসে এই সাপে কামড়ায়। সুক্ষ্ম মশার কামড়ের মত , প্রায় ব্যথাবিহীন কামড় , অধিকাংশ আক্রান্ত ব্যক্তিই বুঝতে পারেন না। সকাল বা ভোর রাতে পেটে ব্যথা , গলায় ব্যথা , গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা এরকম নানান বিচিত্র উপসর্গ নিয়ে এসব রুগী হাসপাতালে আসে।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা তাঁদের শিক্ষিত চোখে , সাপে কামড়ের রোগ লক্ষণ বুঝতে পারেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভ্রান্ত ধারণার জন্য , প্রায়ই রুগী বা তার বাড়ীর লোক , এটাকে সাপের কামড় বলে মানতে চায়না। ওই যে , " বিষধর সাপের কামড় মানেই দুটি দাগ থাকবে" , এই বিভ্রান্তিকর ধারনাটা মারাত্মক। কালাচ সাপ কামড়ের সুক্ষ্ম দাগ খুঁজেই পাওয়া যায় না। কামড়ের দাগ খোঁজা , ইত্যাদি করতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হয় । এই সময় নষ্টের কারনেই বেশ কিছু কালাচ সাপ কামড়ের রুগীকে, পর্যাপ্ত সাপের ওষুধ , এ ভি এস দিয়েও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর উপর ভরসা রাখুন। সাপের কামড়ের রুগী নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার থেকে , দ্রুত কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে, রুগীকে ভর্তি রাখাটাই সবথেকে নিরাপদ ।

কয়েকটি কালাচ সাপের কামড় এর রুগীর ইতিহাস

২০১১ সালের ১৪ ই আগস্ট, সকালে একজন ৩২ বছর বয়সের রুগী নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, পেটে ব্যাথা নিয়ে। সকাল থেকে ঘন্টা পাঁচেক চিকিৎসার পর রুগীকে ছুটি করে দেওয়া হয়। শরীরে কিছু অসুবিধা থাকায় দুপুর বারোটা দশ মিনিটে নস্করবাবু ন্যাশনাল মেডিক্যালে এসে ভর্তি হন। জুনিয়ার ডাক্তার শ্রীজীতা বলেছিল, রুগীর বিছানার নম্বর ছিল, আর এফ ওয়ান - ১২৭। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আবার পেটব্যথার চিকিৎসাই চলে। বড়রা বিকেল তিনটে পর্যন্ত দেখে যান। সন্ধ্যে সাতটার পর শ্রীজীতা ঐ রুগীর কাছে গেলে সাপের কামড়ের নির্দিষ্ট রোগ লক্ষন দেখে নিশ্চিত হয়ে যায়, রুগীটি কালাচ সাপ কামড়ের রুগী। ও সঙ্গে সঙ্গে দশটি আন্টি ভেনম চালিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে রুগী সুস্থ হয়ে যান। বড়রা এসে এসব দেখে অবাক হয়ে যায়। যে প্রশ্নটা আমি ডাক্তারবাবুদের প্রশিক্ষণের সময় সব জায়গায় জিজ্ঞাসা করি; এমন একটা সহজ রুগী, যেটা কিনা মাত্র চারমাসের হাউসস্টাফশিপের অভিজ্ঞতায় শ্রীজীতা ধরে ফেলল, সেটা দুটি মেডিক্যাল কলেজের এতজন সিনিয়র ডক্টর কি করে ভুল করলেন?

কালাচ সাপ

কিংবা যদি উল্টোদিক থেকে বলি। দুটি মেডিক্যাল কলেজের এতজন সিনিয়ার ডাক্তারবাবু যা বুঝলেনই না, একটা জুনিয়ার ডাক্তার মেয়ে কি করে নিশ্চিত ভাবে সে রোগটা ধরে ফেলল? কোন ভাসা ভাসা ব্যাপার নয়; নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে রুগীটিকে বাঁচিয়েও ফেলল! অনেকে অনেক রকম উত্তর দিয়েছেন। যেমন, মেয়েটি গ্রামের মেয়ে, এমন অনেক রুগী আগেও দেখেছে। একেবারে একশো শতাংশ ভুল উত্তর। শ্রীজীতা একেবারে মধ্য কলকাতার মেয়ে, রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে কয়েকবার গ্রাম দেখে থাকবে। আর একটা উত্তর খুব শুনি। সিনিয়র ডাক্তারবাবুরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত থাকেন,মন দিয়ে রুগীর কথা শোনেননি। ব্যস্ত তো নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু তাঁদের কাজে সাহায্য করার জন্য এই শ্রীজীতার মত অনেক জুনিয়ার ডাক্তার থাকে।

একটা খুব সুন্দর চিনা বাকধারা আছে। “মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না।“ এই যে কালাচ বলে একটা রহস্যময় সাপ আছে, যেটা সাধারনত গভীর রাত্রে খোলা বিছানায় কামড়ায়। তাছাড়াও ঘুমের মধ্যে কামড়ায় বলে প্রায় নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে রুগী

জানতেই পারে না যে তাকে কিছুতে কামড়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই রুগী সকাল বেলা পেটে ব্যাথা নিয়ে আসে। এসব খবর ট্রেনিং না থাকলে জানাও সম্ভব নয়। শ্রীজীতা কমাস আগে একটা ক্লাশে এসব কথা শুনেছিল .

তার থেকেও বড় কথাটা কিন্তু হল," টাইমিং"। সময়, সময়ই হল আমাদের জীবনে সবথেকে মুল্যবান জিনিস। শ্রীজিতা যথা সময়ে ঐ ১২৭ নম্বরের রুগীটিকে দেখতে গিয়েছিল। কালাচ সাপ কামড়ের একেবারে নিশ্চিত রোগ লক্ষন হল, শিবনেত্র বা টোসিশ। দুই চোখের পাতা পড়ে আসা। সাপটি কামড়ের কতক্ষন পর চোখের পাতা পড়ে আসবে, কোন ঠিক নেই। এটা দু ঘন্টা পর হতে পারে, আবার চব্বিশ ঘন্টা পরও হতে পারে। আমরা ৩৬ ঘন্টা, এমন কি ৪২ ঘন্টা পরও পেয়েছি। আসলে কালাচ সাপটি রাত্রে কখন কামড়ে গেছে আমরা কেউ জানিনা। এছাড়াও একই রোগ, বিভিন্ন জনের মধ্যে আলাদা আলাদা রোগ লক্ষন নিয়ে আসে। হয়তো এক ঘন্টা আগে শ্রীজীতা ঐ রুগীকে দেখে গেলে এই শিবনেত্র পেতোই না।

শ্রীজীতা কোন ইউনিটে কাজ করে, কতোদিন আগের ঘটনা এসব কথা ক্যান্টিনেই জেনে নিলাম। পরদিনই ওয়ার্ডে গিয়ে সিস্টারদের থেকে খাতা নিয়ে ঐ ১২৭ নম্বরের নাম ধাম জেনে নিলাম। কিন্তু ফোন নম্বর না থাকায়, নস্করবাবুকে আর ধরতে পারিনি। জানলাম বাড়ীটা বানতলার ওদিকে।

এই যে বললাম, পরদিনই রুগী সুস্থ হয়েগেল, কথাটা পুরোটা ঠিক নয়। কালাচ বা কালোচিতি সাপের কামড়ের রুগী বেশীরভাগ সময় পেটে ব্যাথা নিয়ে আসে। এছাড়াও গলা ব্যাথা, ঢোক গিলতে অসুবিধা, গাঁঠে গাঁঠে ব্যাথা , এমনকি মৃগি রুগীর মত খিঁচুনি নিয়েও এসেছে। ছোট বাচ্চারা শ্বাস কষ্ট নিয়েও এসেছে। এই যে সব উপসর্গ নিয়ে রুগীরা আসে, ডাক্তারী ভাষায় এদের বলে প্রেজেন্টিং সিম্পটম। আর ঐ যে চোখের পাতা পড়ে আসছে,অর্থাৎ শিবনেত্র, এদের বলাহয় ফাইন্ডিং। অর্থাৎ ডাক্তাররা পরীক্ষা করে ওটা পেলেন।

কালাচ সাপ কামড়ের চিকিৎসার সময় এই দুটি জিনিস ভালো করে বোঝা দরকার। এই যে প্রথম দশটি এ এস ভি দেওয়ার পর রুগী সুস্থ হয়ে যাচ্ছে বলছি, সব ক্ষেত্রেই রুগীর ঐ সব প্রেজেন্টিং সিমটম কয়েক ঘন্টায় চলে যায়। অর্থাৎ যে কষ্টের জন্য রুগী এসেছিল,সেগুলি চলে যায়। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই, শিবনেত্রটা থেকে যায়। এইটি নিয়ে অনেক সময়ই চিকিৎসকরা বিভ্রান্ত হন। শিবনেত্র তিন চার দিনও থেকে যায়। আমি দেখেছি হাসপাতালে ভর্তি রুগী এ এস ভি পাওয়ার পর বসে বিস্কুট খাচ্ছে। কিন্তু শিবনেত্র আছে বলে, ডাক্তারবাবু আরও এ এস ভি দিতে বলছেন।

শ্রীজীতার এই ঐতিহাসিক কাজটাকে আমি একান্ত নিষ্ঠায় প্রচার করে যাচ্ছি গত নয় বছর ধরে। পরে মৌমিতা , আলম , শুভেন্দু বা রাজীবের মত অনেকেই ছোট ছোট গ্রামীন হাস্পাতালে এমন অনবদ্য সব সাফল্য দেখিয়েছে। কিন্তু আমাদের মেডিকেল কলেজগুলিতে আজ ও নিয়মিত পড়ানোর মধ্যে সাপের কামড়কে আনা যায়নি।

বেশ কয়েক বছর হল, আমার ক্লাশে পড়ানোর জন্য, কালাচ সাপের ভিডিয়োটা প্রথমেই দেখাই। তারপর শ্রীজীতার গল্প। ২০১৪ সালের পর থেকে, নতুন সংযোজন হল, আলিপুরদুয়ারের নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডা মুখার্জীর কথা। আলিপুরদুয়ার হাসপাতালের স্পেশালিষ্ট ফিজিসিয়ান, ডা যুধিষ্টির দাসের সাথে ঐ দিনই আলাপ। নিজের নামের প্রতি এমন সুবিচার সহসা দেখা যায় না। ধীর স্থির অমায়িক ভদ্রলোক, এমন মানুষ দুর্লভ। উনিও খুবই ব্যস্ত ডাক্তার। কিন্তু সাপ কামড়ের মত অবহেলিত বিষয় সম্বন্ধে ওনার কোন ছুৎমার্গ নেই। সুপারের ঘরে বসে কুড়ি বাইশ জন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে সাপের আলোচনা শুরু করলাম। পরে

আরও দু একজন এলেন। সন্ধ্যেয় ক্লাশের একটা সুবিধা হল, হাসপাতালের কাজ সেরে সবাই আসতে পারেন। শ্রীজীতার পেট ব্যথা রুগীর ইতিহাস বলতে বলতে চলে গেলাম চব্বিশ ঘন্টায়।চোখের পাতা পড়ে আসতে পারে দুই থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর।

এবার একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসে থাকা ঐ হাসপাতালের নাক কান গলার সার্জেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, ওনার রুগীর চোখের পাতা পড়েছিল ৪২ ঘন্টা পর। অ্যা, বিয়াল্লিশ ঘন্টা? আগে আমি কোনদিন শুনিনি। সেই শ্রীজীতার রুগীর মত, এই পর্যন্ত বলেই আমি আমার ক্লাশে জিজ্ঞেস করি, ই এন টি সার্জেন কি করছিল সাপেকাটা রুগী নিয়ে? আজকাল অনেকেই ঠিক উত্তরটা বলতে পারেন। ঐ বছর চল্লিশের মহিলা গলাব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। টনসিলের ব্যাথা বলেই চিকিৎসা চলছিল ।ডা মুখার্জী আগে বার চারেক দেখেছেন। পঞ্চমবার দেখতে গিয়ে দেখেন, শিবনেত্র বা টোশিস। সঙ্গে সঙ্গে ডা যুধিষ্টির দাসকে ডেকে পাঠান। ওনারা দুজনে সাপ কামড়ের চিকিৎসা করে রুগীটিকে বাঁচান।

এই যে কালাচ সাপ কামড়ের রুগী টনসিলের ব্যথা বলে চিকিৎসা পাচ্ছিল, এটা আমাদের কাছে খুব একটা নতুন কিছু খবর নয়। মেচেদার তপনও প্রথমে গলাব্যথাই বলেছিল। তপনের খবর আমাদের রাজ্যের সরকারি প্রশিক্ষণ পুস্তিকায় বিস্তৃত আছে।

এছাড়াও গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা নিয়েও কালাচ কামড়ের রুগী আসতে পারে। বাচ্চা রুগী শুধু শ্বাস কষ্ট নিয়েও এসেছে। হঠাৎ শিবনেত্র হলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে, ওটা কালাচের কামড় হতে পারে।

গতবছরই ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে একজন সাঁইত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান লোক পিঠে ব্যথা নিয়ে ভর্তির ঘন্টা তিনেক পরে মারাযান। পিঠে ব্যথার চিকিৎসা চলতে চলতেই রুগী পেটে ব্যথা বলেন। পেটব্যথা কমানোর ওষুধপত্রের পর বলেন গলাব্যথা হচ্ছে। নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ দেখে কোন গন্ডগোল পাননি। একটু পরে রুগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অক্সিজেন দেওয়ার আধঘন্টা পর রুগী মারাযান। আমরা নিশিত, আগের রাতেই ওনাকে কালাচ সাপে কামড়েছিল।

এত লোকের এমন ভ্রান্ত ধারনার কারন কি? কারন অর্ধ সত্য জানা। তাহলে বাকী সত্যটা কি? সাধারন ভাবে একটা খুব প্রচলিত ধারণা আছে যে, বিষধর সাপ কামড়ালে দুটি কামড়ের দাগ থাকবে। এটাই সবথেকে গন্ডগোল করছে। ফনা যুক্ত সাপের কামড়ে সাধারণত দুটি দাগ থাকে। আমাদের রাজ্যে মূলত দুই ধরনের ফনাযুক্ত সাপ আছে। গোখরো আর কেউ টে সাপ। এদের কামড়েও যে দুটি দাগ হবেই এমন কোন কথা নেই। একটি দাগ হতে পারে। একটা চেরা মত দাগ হতে পারে।

এছাড়া চন্দ্রবড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেও দুটি বা একটি দাগ হয়। ফণা যুক্ত সাপের কামড় সাধারনত ভুল হয় না। এদের কামড়ের সাথে সাথেই কামড়ের জায়গায় প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়। অন্ধকারে বা ঝোপে ঝাড়ে হয়তো একটা কাঁটা ফোটার মত মনে হল। কিন্তু ফণা যুক্ত সাপের কামড় হলে ঐ সামান্য কাঁটার দাগের সাথে এমন ভয়ঙ্কর জ্বালা ব্যথা অনুভব হবে যে, ওটা সাধারন কাঁটা ফোটা নয় বোঝাই যায়। বোলতার হুল বা কাঁকড়া বিছের হুলেও প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জায়গাটা প্রায় ফোলেই না। কিন্তু গোখরো বা কেউটে সাপের কামড় হলে, জায়গাটা দ্রুত ফুলে উঠতে থাকে। ফোলা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ক্রমশ বাড়তে থাকা ফোলা আর প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণার জন্যই আক্রান্ত ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে আসে। এই যে একটা সাপে কামড়ের পর একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরী হয়, এটা প্রায় সবাই জানে বা দেখেছে। এবার কলাচ সাপ কামড়ের মতো নিঃশব্দ ঘাতকের ক্ষেত্রে যখন কোন ডাক্তারবাবু চোখের পাতা পড়ে আসার মত বিচিত্র কোন লক্ষণ দেখে , সাপে কামড়েছে বলেন, তখন মেনে নেওয়া খুব সমস্যা হয়।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েও মাঝে মাঝে তেমন জ্বালা যন্ত্রনা থাকে না। কাঁটা ফুটেছে বা কোন পোকা মাকড়ে কামড়েছে মনে করে রুগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে দেরী করে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েও জায়গাটা আস্ত আস্তে ফুলতে থাকে। কিন্তু ফণাযুক্ত সাপের কামড়ের মত দ্রুত না ফোলার জন্য রুগী প্রথম দিকে অবহেলা করে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে রুগীর দেহে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল দেখা দেয়। এই রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল কামড়ের আধ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে চার ঘন্টা পরেও শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি। রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হলে রুগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত বেরতে থাকে। সাপাএর কামড়ের জায়গা থেকে বা কোন ইঞ্জেকসন দেওয়ার জায়গা থেকে রক্ত দেরতে থাকে। এছাড়া দাঁতের গোড়া থেকে, নাক থেকে , পুরনো কোন ঘা থেকে , কফ থুতুর সাথেও রক্ত বেরতে থাকে। পাকস্থলীতে রক্ত ক্ষরণ হলে রক্ত বমি হয়। চিকিৎসায় দেরী হলে আস্তে আস্তে রুগীর কিডনী বিকল হতে শুরু করে। মূত্রে রক্ত এসে যাওয়া কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ। ক্রমশ প্রস্রাব কমতে কমতে এক সময় একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তখন রুগীকে বাঁচানোর জন্য ডায়ালিসিস লাগে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের পর চিকিৎসায় দেরী হলে কিডনী যদি খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় , তখন ডায়ালিসিস করেও রুগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

কালাচ বা ফণাযুক্ত গোখরো-কেউটে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় দেরী হলে রুগীর শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে রুগী মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালু রাখার জন্য ভেন্টিলেটার মেশিন দরকার হয়। রুগীর শ্বাসকার্য বন্ধ হওয়ার আগেই দশটি , কোন কোন ক্ষেত্রে কুড়িটি এ এস ভি (সাপের বিষের আন্টিভেনাম সিরাম) রুগীর শরীরে ঢোকাতে পারলে আর ভেন্টিলেটার লাগে না। ফণাযুক্ত গোখরো-কেউটে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আট্রোপিন আর নিওস্টিগমিন নামের খুব সামান্য দামের দুটি ওষুধ খুব জরুরী । এই দুটি ইঞ্জেকসন না দিয়ে শুধু এ এস ভি দিলে রুগী নাও বাঁচতে পারে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেও খুব তাড়াতাড়ি এ এস ভি চালাতে হবে; দেরী হলেই কিডনী বিকল। গত বছর তিনেক ধরে পশ্চিমবাংলায় চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে যথেষ্ট এ এস ভি দিয়েও ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর পিছনে এ এস ভি উৎপাদনের একটি সমস্যা বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। সেটা একটু বিস্তৃত আলোচনার বিষয় । আমাদের ফেসবুক পেজ " পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব এ ভি এস চাই" দেখলে , চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের সমস্যাটা বুঝবেন।

সবার শেষে আবারও বলছি, সাপে বা সন্দেহজনক কিছু কামড়েছে মনে হলে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ীর কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। ওখানকার ডাক্তারবাবুর কথা মত চলুন।

পুনশ্চ ঃ সাপের কামড়ের রুগীকে মোটরবাইকে করে নিয়ে যাওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। অবশ্যই একজন রুগীর পিছনে বসে , রুগীকে ধরে নিয়ে চলবেন। ছবি দেখলে ভালো বুঝবেন।

Dry Bite

সিঁড়ি

সিঁড়ি একটা খুবই সাধারন জিনিস। আমরা সকলেই, প্রতিদিনই সিঁড়ি ব্যবহার করছি। সবসময় পায়ের তলায় থাকলেও সিঁড়ির অবদান মাথায় তুলে রাখার মতই। জীবনে যেখানেই হোক আর যখনই হোক, উপরে উঠতে গেলে সিঁড়ি লাগবেই। সিঁড়ির বিকল্প লিফ্ট হলেও, সিঁড়ি কিন্তু রাখতেই হবে। আচ্ছা, এমন বাড়ী কি কেউ দেখেছেন, শুধুই লিফ্ট আছে, সিঁড়ি নেই? আসলে ঐ লিফ্টকেও আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে।

বাড়ী ছাড়াও অনেক জায়গায় সিঁড়ি থাকে। সাধারণত বাড়ীর বারান্দা বা নিচের তলাটাও উঠান বা রাস্তা থেকে একটু উঁচু থাকে; দু এক ধাপ সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয়। আমাদের গ্রামের ওদিকে মাঝে মাঝেই বন্যা হয়েযায়। এজন্য বাড়ীগুলি রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তত দশ বারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভেতরের উঠানে ওঠার জন্যও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। এখন অনেক বিরল হলেও গ্রামের মাটির বাড়ীও দোতলা এমনকি তিন তলাও হয়। মাটিরই সিঁড়ি হয়। অনেক বাড়ীতেই কাঠের সিঁড়িও হয়। কাঠের সিঁড়ি বেশী দেখা যায় পাহাড় অঞ্চলে। এছাড়া জংগলের বাংলো বা রিসোর্টের সিঁড়িগুলিও কাঠের হয়।

পুকুর ঘাটের সিঁড়িও গ্রামে বহুল ব্যবহার হয়। এই সিঁড়ি পাকা বাঁধানো হতে পারে; কিন্তু বেশীরভাগই কাঠের গুঁড়ি বা বড় বড় পাথরের তৈরী। বর্ষায় যখন পুকুর জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায় এসব কাঠের বা পাথরের সিঁড়ি ডুবে থাকে।

আবার যখন একটু একটু করে জল নামতে থাকে, ঘাটের সিঁড়িও একটা করে জেগে ওঠে। এই সিঁড়ির ধাপে বসে, ছিপ দিয়ে পুঁটিমাছ ধরা, আমাদের ছোটবেলায় একটা ভালো খেলা ছিল। এখনও গ্রামের বাড়ী গেলে, একটু সময় পেলেই পুকুরের ঘাটে ছিপ ফেলতে চলে যাই। কৈশোরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এক একবার স্বপ্নের মত দেখতে পাই, একটা ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিপ ফেলছে, চল্লিশ বছর বা তারও আগে।

ঘাটের সিঁড়িতে খেলার দারুন সব সুখ স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের পাকা ঘাটের সাথে। হাসপাতাল অর্থাৎ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠই ছিল আমাদের খেলার মাঠ। মাঠের পাশেই সিমেন্ট বাঁধানো ঘাট। খুব ছোটবেলায় যখন মাঠের খেলায় জায়গা পেতাম না, ঐ পাকা ঘাটের সিঁড়িতে খেলতাম।

লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি একটা একটা করে নেমে গেছে জলে। জল যতোই নামুক, শেষ সিঁড়িটা কখনওই বেরত না। ঐ সিঁড়িতে অনেকে সাবান দিয়ে কাপড় জামা কাচত। আমরা ওখানে ছিপ ফেলে মাছও ধরেছি। পরে অনেক জায়গায় পুরনো রাজবাড়ি বা মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ি বড় দিঘী বা নদীতে নেমে গেছে দেখেছি। আমাদের পাকা ঘাটের সিঁড়ি বোধহয় বারো কি চোদ্দটা ছিল। দিনাজপুরের বাহীন রাজবাড়ির পিছনের ঘাটের গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি নদীতে নেমে গেছে।

ঘাটের সিঁড়ি বললেই মনে আসে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। ঐ ঘাটের সিঁড়িও এক একটা সিনেমা বা উপন্যাসের চরিত্র। মনে আছে, জয়বাবা ফেলুনাথ? আর এক জায়গায় কয়েকশ সিঁড়ি নর্মদা নদীতে নেমেছে, ওংকারেশ্বরে। ঐ সিঁড়িতে বসেই প্রলয় দাসজী কত উপদেশ দিয়েছেন শৈলেনবাবুকে। হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি দেখলাম সিঁড়িতে বসে। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের কাছেও সুন্দর সিঁড়ি নেমেছে গঙ্গায়।

যে কোন তীর্থ বা মন্দিরেই সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। কয়েকমাস আগে ঘুরে এলাম রুদ্রপ্রয়াগ। সঙ্গমের জলের কাছে চলে গেলাম, কয়েকশ সিঁড়ি ভেঙেই। এই সিঁড়ি ভাঙার ভয়েই নামাহল না পাঁচমারীর বিখ্যাত বী ফলসে। আগেরদিন অবশ্য শ খানেক সিঁড়ি ভেঙেই উঠেছিলাম পান্ডব গুহায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে জব্বলপুরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির দেখলাম না। উড়িষ্যার উদয়গীরি খন্ডগীরিও ওঠা হয়নি ঐ সিঁড়ির জন্যই। তবে অজন্তা আর ইলোরায় কয়েকশো সিঁড়ি ভাঙতেও কোন অসুবিধা হয়নি। বেড়াতে গিয়ে সবথেকে খাড়া সিঁড়ি ভাঙলাম দৌলতাবাদ দূর্গে। অবশ্য পাহাড়ের মাথায় একেবারে ফাঁকা একটা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুরীর মন্দিরেও অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। ওপরে যাওয়ার পর আবার বেশ সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পাতালেশ্বর শিব দেখতে হয়।

কলকাতার পাতাল রেলে তো শুধুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা। কয়েকটা জায়গায় চলমান সিঁড়ি আছে বটে, তবে বেশীর ভাগই সিমেন্টের সিঁড়ি। দিল্লি আর হায়দরাবাদের মেট্রোতে চড়তে হলে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠতে হয়।

গাড়ীর সিঁড়ির কথা যখন এসেই গেল, কোন কোন গাড়ীতে সিঁড়ি ছাড়া চলেনা, দেখা যাক। বাসে ট্রামে দরজায় দু তিন ধাপ সিঁড়ি। আগে যখন দোতলা বাস ছিল তখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। এক এক সময় ঐ সিঁড়িতে এমন ভীড় হত যে দম বন্ধ করে দিত। এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠার জন্য দরজায় সিঁড়ি আটকানো থাকে। লোকাল ট্রেনে সব দরজায় সিঁড়ি না থাকলেও আজকাল অনেক দরজার নিচে সিঁড়ি থাকছে। বাসের ছাদে ওঠার জন্য পিছনে সিঁড়ি থাকে। কিছু কিছু লোক প্রচন্ড ভারী বোঝা মাথায় করে ঐ সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে যায়।

লরীর পেছনে একটা শক্ত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে মালপত্র তুলতে দেখেছি। নৌকা বা লঞ্চে ওঠার জন্যও ঐ রকম একটা পাটাতন সিঁড়ি খুব ব্যবহার হয়। চুচুড়ার লঞ্চে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেযেতে হয়। বড় বড় লঞ্চ বা জাহাজের বিভিন্ন তলায় ওঠা নামার জন্য সাধারণত কাঠের সিঁড়ি। জাহাজের মাস্তুল আর কারখানার চিমনির গায়ে লোহার সিঁড়ি তৈরী করা থাকে।

এরোপ্লেনে ওঠার জন্যও সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। তবে কোলকাতার মত বড় বিমান বন্দরে এখন সিঁড়ি ছাড়াও ওঠার ব্যবস্থা আছে। রেল ষ্টেষনে সিঁড়ি থাকেই। মাথার ওপর দিয়ে লাইন পেরনোর জন্য ফ্লাইওভারের সিঁড়ি। আগে সবই কাঠের ছিল; এখন নতুন সব সিমেন্টের হচ্ছে। ছোটবেলায় কাঠের ফ্লাইওভারে উঠতে খুব ভয় পেতাম। সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত। এখন অনেক ষ্টেশনেই সাবওয়ে হচ্ছে। আমি দেখেছি ওভারব্রীজের থেকে সাবওয়ে বেশী সুবিধাজনক লাগে।

গাড়ী তো হল ; ঘোড়ায় চড়ার জন্যও কি সিঁড়ি লাগে? দেখিনি কোথাও। তবে হাতির পিঠে চড়ার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে জলদাপাড়া অভয়ারন্যে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা প্লাটফর্মে পৌছে হাতির পিঠে উঠেছিলাম। কুলিক পক্ষী নিবাসে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠে সিমেন্টের টাওয়ার থেকে পাখি দেখা যায়।

সিঁড়ির রকমফের নিয়ে কটা কথা বলি। সাধারনভাবে পাকা বাড়ীর একতলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার জন্য যে সিমেন্টের সিঁড়ি হয়, সেগুলির অর্ধেক একমুখি নেমে একটু চওড়া জায়গা বা ল্যান্ডিং; তারপর আরেক মুখে বাকিটা ওঠার। অনেক বাড়ীতে একটু গোলকরে ঘুরিয়েও সিমেন্টের সিঁড়ি হয়। নিজের বাড়ী বেশ খরচ করে ডিজাইনার দিয়ে প্লান করে যারা বানায়, তাদের সিঁড়িই বাহারি হয়। ঐ সিনেমা বা সিরিয়ালে যেমন হয়। প্যাচানো লোহার সিঁড়ি দু একটা এখনও দেখা যায়। কলকাতার শহিদ মিনার আর দিল্লির কুতব মিনারের ভেতরে সিমেন্টের প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে শুনেছি, ঢোকা হয়নি কোনদিন।

সিঁড়ি বললে কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে আটকানো ওঠা নামার ব্যবস্থাই বোঝায়। আর সিঁড়ি যদি সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার মত হয় তখন তাকে মই বলে। মই আমরা ছোটবেলায় বাঁশের তৈরীই দেখতাম। এখন কাঠের, লোহার, আলুমিনিয়ামেরও দেখা যায়।

বাস্তবের সিঁড়ি ছাড়াও কয়েকরকম সিঁড়ির কথা শোনাযায়। রাবন রাজা নাকি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন। কবিরাতো স্বপনের সিঁড়ির কথা লিখেই গেছেন। স্কুলের অংকের ক্লাশে সিঁড়িভাঙা অংক আমরা করেছি। আমি অনেকদিন আগে একটি মুষ্টিযোগ শিখেছিলাম ; বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে, চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকুন, একটা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামছেন। একটা একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে দিয়ে নামছেন, সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়বেন।

একটা তলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার সোজা একটা সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট বেশী হয়। মাঝে একটা ল্যান্ডিং থাকলে কষ্ট যেন একটু কম হয়।

চলমান সিঁড়ির মত আর একটা যান্ত্রিক সিঁড়ি হয়, দমকল দপ্তরের হাইড্রোলিক সিঁড়ি। অনেক উঁচুতে দ্রুত ওঠাযায়।

লোহার প্যাচানো সিঁড়ি ছাড়াও সোজা লোহার সিঁড়িও অনেক জায়গায় দেখেছি। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়ি হয়েছে অনেক পরে। আমাদের ছোটবেলায় কয়েকজন জানালা ইত্যাদিতে পা দিয়ে ঐ ছাদে উঠতে পারতো,তখন ওদের বীর ভাবতাম। অমর কন্টকের দুধধারায় পৌছতে শেষে এক জায়গায় লোহার সিঁড়ি হয়েছে এখন; আগে লোকে কি করে পৌছত জানিনা। দমদমে আমার ফ্লাটের লাগোয়া লোহার সিঁড়ি বিখ্যাত। পাড়া থেকে রেল লাইনে ওঠার পঁচিশ তিরিশ ধাপ সিঁড়ির মাঝের আট ধাপ লোহার,তাতেই নাম, লোহার সিঁড়ি।

সিঁড়িই হোক আর মই হোক, ওঠাটাই সহজ, আর সবাই উঠতেই চায়। যে কোন সিঁড়িতে নামার সময়ই বিপদগুলি হয় ; একটু অসাবধান হলেই পড়ে হাড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা। লুডো খেলায় মই আর সাপ দুইই থাকে, তবু কেন সাপ লুডোই বলে জানিনা। বেচারা সাপগুলোর সম্বন্ধে শিশু বয়েস থেকেই বাজে ধারনা তৈরী হয়। আসলে টেনে নামানোর জন্য সাপেদের কোন অবদানই নেই। মানুষই মানুষকে টেনে নামায়। আর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া, সে তো মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

https://www.amazon.in/dp/8188036501/_encoding=UTF8?coliid=IC3KGMXZ3T9OM&colid=35GN1EMW6HCU7&psc=0

হাতখান ধইরে দ্যাখ ক্যানে

নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সুশান্ত । কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর আরও বছর তিনেক জুনিয়ার ডাক্তার হয়ে কাজ করেছে। তারপর একদিন সরকারী চাকরী নিয়ে চলল উত্তর বঙ্গে। নতুন জেলা সদর থেকে আরও চল্লিশ মাইল দূরের একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার। মনটা একটু খারাপ ছিল; সেই চাকরীর চিঠিটা হাতে আসার পর থেকেই। স্নেহশীল বড় দাদার মত মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রত্যেকের মনের অবস্থা বুঝে, একেকজনকে একেক ভাবে সাহস জুগিয়েছেন। সুশান্তকেও বলেছেন, " তোমার সবথেকে ভাল পোষ্টিং হয়েছে। আমাদের ট্রেন ধরতে মালদা যেতে হয়; তোমার ওখানে দার্জিলিং মেল সহ বেশ কয়েকটা ট্রেন থামে। এক ট্রেনে কোলকাতা যেতে পারবে।

বিকেলের দিকে নিজের সামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে বাস থেকে নেমেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টার পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। অনেক জায়গায় শুনেছে, বাস থেকে নেমে আবার চার পাঁচ কি মি রাস্তা ভ্যানে বা হেঁটেও যেতে হয়। পাশের কোয়ার্টারেই থাকে প্রায় সমবয়সি ফার্মাসিষ্ট। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফার্মাসিষ্ট ছেলেটির সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সেও খুব উৎসাহ দিল। প্রথম রাতেই ঠিক হয়ে গেল , দুজনের রান্না একই জায়গায় হবে, একজন মাসিই সব কাজ করবে।

এত বছর মেডিক্যাল কলেজে কাজ করার অভিজ্ঞতা এক রকম ; আর একেবারে একা একা একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করা আর এক রকম। ফার্মাসিষ্ট একা একাই চালিয়েছে বছর খানেক। ওর কাছেই কাজের হালচাল জেনেছে , রাতের মধ্যে যেটুকু জানা যায়। সকালে নটার মধ্যে তৈরী হয়ে আউটডোরে বসে গেল সুশান্ত। ছোটখাট একটা লাইন। আসলে লাইন না বলে জটলা বলাই ভালো। গ্রামের লোকেরা অত শত লাইন টাইন বোঝে না। নতুন ডাক্তার আসার খবরটা "কুম্পান্ডার বাবুই" ওদের দিলেন। ফার্মাসিষ্টই হৈ হৈ করে বললেন, সবাই লাইন করে দাঁড়াও, নতুন ডাক্তাবাবু এসেছেন। একটা লাইন মত হলও। কিন্তু সবাই একটু উকি দিয়ে দেখতে চায়, নতুন ডাক্তারটি কেমন দেখতে। একেবারেই গ্রামের গরীবগুর্বো লোকজন। এক এক করে রুগী দেখতে শুরু করল সুশান্ত। সবারই কথায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী টান। প্রথম দিকে লাইনটা দরজার বাইরে থাকলেও একটু পরেই ঘরের ভিতর জনা পাঁচেক রুগী ঢুকে গেল। এক দুবার ফার্মাসিষ্ট এসে দরজার বাইরে লাইন করে দাঁড়াও বললেও, পাঁচ মিনিটেই আবার ঘরের ভিতরে চার পাঁচ জন হয়ে গেল।

এখানে এটাই দস্তুর। তার উপর নতুন ডাক্তার। ভালো করে দেখে নিতে হবে তো। পাড়ায় গিয়ে বলতে হবে না; ডাক্তারটা "হ্যান্টা" কিনা।

গ্রামের লোকেরা কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে আসেনা এমন নয়। তাই ওদের দেখতে বা ওদের কথা বুঝতে খুব একটা অসুবিধাও হচ্ছিল না। ঘন্টা দেড়েক রুগী দেখার পর এল প্রথম চমকটা। একটা কম বয়সের বৌ এসেছে দেখাতে। টুলে বসার পর সুশান্ত জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে? অসুবিধা কি? রুগী

চুপচাপ। লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে থাকল। সাথে এসেছে একটু বয়স্কা মহিলা। রুগীর মা কিংবা শাশুড়ী হবেন। বার তিনেক জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর না পেয়ে, সুশান্ত সাথের মহিলাকেই বলতে বলল। এবার যেন বয়স্কা মহিলা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, " হাতখান ধইরে দেখ কেনে"! চমকে উঠল সুশান্ত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় বা জুনিয়র ডাক্তার থাকার সময়ও কেউ কোনদিন ওকে তুই করে কথা বলে নি। সে তো গেল একটা দিক। এমন এক গ্রাম্য মহিলা তুই করে বলায় খুব একটা অপমানও মনে হয়নি সুশান্তর। কিন্তু হাত ধরে, মানে নাড়ি ধরে কি বুঝতে বলছে ওকে? এতো মহা ফ্যাসাদ। আপাত সুস্থ , কম বয়সি বধুটির তেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। নিজের বিব্রত ভাবটা গোপন রাখার জন্যই সুশান্ত রোগিণীর পালস্ দেখতে শুরু করল। কোন গন্ডগোল নেই। ভালো করে দেখার জন্য অনেকক্ষন ধরে দেখল পালস্। ডাক্তারের মুখ দেখে বয়স্ক মহিলা বুঝল যে ডাক্তার " ধরতে পারছে না"! এবার যতোটা সম্ভব আস্তে করে বলল, " প্যাটে বাচ্চা আছে কি?" এবার সুশান্ত বুঝে গেছে। বৌ এর পেটে বাচ্চা আছে কিনা সেটা মুখে বলতে চাইছে না। বৌ তো লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকবেই। এতগুলি বাইরের লোকের কাছে , শাশুড়ীমাও বা কি করে বলে? এবার ডাক্তারকে একটু "হ্যান্টা" হতে হল। ঘরের ভিতর ঢুকে আসা বাকী লোকগুলোকে বের করতে হল। নাড়ি টিপে পেটে বাচ্চা আছে কিনা বলার শিক্ষা সুশান্ত পায়নি। সুশান্ত কেন, ওর কোন শিক্ষক ও কোনদিন এমন কথা শোনেননি। সে যাই হোক, কটা মাসিক বন্ধ আছে ইত্যাদি জেনে , ডাক্তারের রায়টা জানাতে পেরেছিল সুশান্ত।

এ গল্প আমি সুশান্তর কাছে শুনেছি অনেক পরে। কিন্তু শোনার সাথে সাথেই আমার এক শিক্ষকের বহু পুরনো শিক্ষা মনে পড়ল। তখন আমরা সবে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। মেডিক্যাল ওয়ার্ড এ ক্লিনিক্যাল ক্লাশ শুরু করেছি। ঐ একজন স্যারই বলেছিলেন, পালস্ দেখে অনেক কিছুই বোঝা যায়। এ কথা অনেক স্যারই বলেছেন, শিখেওছি। কিন্তু ঐ একজনই বলেছিলেন, সব রুগীর পালসে আগে হাতটা রাখবে। কিছুই হয়তো পাবে না , কিন্তু পালস্ এ হাত রেখে রুগীর সাথে কথা বলার অনেক সুফল পাবে। রুগী তোমার ওপর আস্থা রাখবে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

একেবারে একশ ভাগ চোখের ডাক্তার হয়ে যাওয়ার আগে , স্যার এর ঐ শিক্ষা বেদবাক্য -এর মত মেনেছি। চোখের ডাক্তার এর পালস্ দেখার দরকার হয় না সব সময়। তবুও অভ্যাসটা থেকে গেছে। এখন আবার উল্টোও ভাবে কেউ কেউ। এখন তো মেশিনের যুগ। গায়ে চুলকানি নিয়ে এসেও কেউ কেউ জানতে চায় , স্ক্যান করার দরকার আছে কি না! পালস্ দেখে " ব্রাডি অ্যারিথমিয়া" পেয়ে , রুগীকে হার্টের ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছি। সেই রুগীর ইসিজি করে আমার রোগ নির্ণয় কে মান্যতা দিয়েছেন , হার্টের ডাক্তার বাবু। এখন আর লোকে পালস্ দেখে " সময় নষ্ট করে না"! বৈদ্যি নাকি?

আমার সামনে কোন রুগীকে হাঁপাতে দেখলেই আমার হাতটা রুগীর পালস এ চলে যায়। কে যেন অলক্ষে বলে, " হাতখান ধইরে দ্যাখ কেনে"!

হাতি

হাতি আমাদের খুব পরিচিত প্রাণী। বিশাল চেহারা আর তার সাথে ঐ অদ্বিতীয় শুঁড়, প্রাণীটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তার সাথে যোগ হয়েছে গণেশ ঠাকুরের মাথাটি। সব মিলিয়ে হাতি একটি পূজনীয় প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ছোট বেলায় অ আ ক খ শেখার সময় ঐরাবত হাতীর ছবি দেখেছি। কিন্তু তারও আগে আমরা জ্যান্ত হাতিও দেখেছি। না' বুনো হাতি নয়, পোষা হাতি। তাহলে কি আমাদের বাড়ীর কাছে কোন রাজ বাড়ী বা জমিদার বাড়ী ছিল? না, তা নয়।

দু -এক বছর পর পর এক -দুটি হাতি নিয়ে পশ্চিম দেশের কয়েকজন লোক আমাদের গ্রামের দিকে আসত। তখন হিন্দি ভাষা কি জানতাম না। কিন্তু ঐ হাতীর সাথের লোকগুলি যে আমাদের ভাষায় কথা বলত না, সেটা বুঝটাম। হাতিও যেন ওদের অনেক কথা বুঝতে পারত। ওরা হাতি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ধান, টাকা পয়সা সংগ্রহ করত। সে সব দিনে সাপ খেলা, বাঁদর নাচ দেখানো, এমনকি একবার একটি ভালুক নিয়েও ভিক্ষা করতে এসেছিল একজন। হাতি যেহেতু প্রায় দেবতার মর্যাদা পেত, এদের ঠিক ভিক্ষা করতে এসেছে ভাবা হত না। হাতির কপালে অনেকটা সিঁদুর লেপা থাকত। মাহুত খুশী হলে, বা কেউ চাইলে , ঐ হাতীর কপালের সিঁদুর নিয়ে একটু বাচ্চাদের কপালে টিপ দিয়ে দেওয়া হত। সার্কাসের হাতিও আমরা ছোটবেলায় খুব দেখেছি। হাতিদের নানান রকমের কসরত আমাদের মুগ্ধ করত। কয়েক বছর আগে এক সার্কাসের পোষা হস্তিনীকে এক জংলী দাঁতাল হাতি, বেড়া ভেঙ্গে নিয়ে যায়।

এই গ্রামে নিয়ে আসা হাতীদের রং কালো হত। বাঁকুড়ায় কলেজে পড়তে গিয়ে, বাঁকুড়ার বন্ধুদের কাছে শুনলাম , ওদের ওদিকে যে সব জংলী হাতি আসে তাদের রং লাল। বন্ধুরা ফসলের মাঠে নেমে আসা হাতিদের তাড়ায় শুনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। ওদের গ্রামে লাল হাতি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন। একদিন রানিবাঁধে বন্ধুর বাড়ী যাওয়া ঠিক হল। খবর শুনে আট দশ জনের একটা দল হয়ে গেল। রানীবাঁধে গিয়ে পিকনিক করে ফিরলাম। হাতি রাত্রে ছাড়া মাঠে আসেনা। আমি কয়েক বার রাত্রে বন্ধুর বাড়িতে থেকেও হাতি দেখতে পাই নি। ঐ রানী বাঁধে একবার দাদা বৌদির সাথে বেড়াতে গিয়ে রাত্রে ছিলাম। সাইকেল নিয়ে বিকেলে জঙ্গলের দিকে গেলাম। স্থানীয় লোকজন সন্ধের মুখে ফিরে আসছিল, আমাদের সাবধান করে ফিরে যেতে বলল; হাতি বেরোতে পারে বলল।

জঙ্গলের হাতি বাঁকুড়ায় দেখা হয়নি। কিন্তু মেদিনীপুরে দেখলাম একবার , গোটা দশেক জংলী হাতি। তখন সপ্তাহে দুদিন করে মেদিনীপুরে থেকে চন্দ্রকোনা রোড যেতাম। শালবনির পরে আরাবারি জঙ্গল নামে কিছুটা জায়গা জঙ্গল ভেদ করে রাস্তা ।নামেই জঙ্গল, কোনদিন একটা শেয়ালও দেখিনি। সেদিন বাসে না গিয়ে, বন্ধু ডাক্তার সিনহার স্কুটারে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখলাম, রাস্তায় বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে। সাধারণত গাড়ী দুর্ঘটনা হলে এরকম লোক জমে যায়। কাছে গিয়ে দেখি , কয়েকজন লোক গাছেও উঠেছে। সবার মুখেই শুধু হাতি আর হাতি। আমরাও দাঁড়ালাম। রাস্তা থেকে তিরিশ গজ দূরে , ঝোপ ঝাড় এর মধ্যে গোটা দশেক হাতি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এই হাতিগুলির শুধু পিঠ দেখা যাচ্ছিল। পিঠের রং লাল। আসলে ওরা সব লাল মাটি মেখে ছিল। এই হাতীর দলটা কিন্তু

শান্ত ভাবে দাড়িয়ে ছিল। পরে শুনেছি, একজন মানুষ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময়ে দাঁতাল হাতীর সামনে পড়েযায়, হাতি তাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে।

উত্তর বঙ্গে চাকরী করার সময় একবার সপরিবারে জলদাপাড়া জঙ্গল বেড়াতে গেলাম। মাদারিহাটের সরকারী ট্যুরিষ্ট লজে ছিলাম। ওখানে গিয়ে জানলাম, ভোর রাত থেকে হাতীর পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘোরা যায়। কিন্তু রাত নটা পর্যন্ত উৎকন্ঠায় থাকতে হল। শীতের দিনে বৃষ্টি হওয়ায় আদৌ সকালে সাফারী হবে কিনা সেটাই বোঝা যাচ্ছিল না। ভোরে উঠে গাড়ী করে হলং বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। গোটা তিনেক দল ঘুরে আসার পর আমাদের পালা। ঐ সময় আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। একটা জায়গায় দেখি বড় ছোট কয়েকটা হাতি বাঁধা আছে। ছোট বাচ্চারা বাচ্চা হাতি দেখে খুব মজা পেয়েছিল। মনে পড়ল তারও বছর কুড়ি আগে দিল্লিতে এশিয়ান গেমস হয়েছিল। সেই গেমসের ম্যাসকট ছিল, আপ্পু নামের একটা ছোট হাতি।

জলদাপাড়ার পোষা হাতি

তারপর অনেক বছর আমরা হাতীর বাচ্চা দেখলেই তাকে আপ্পু বলতাম। এই হাতীর বাচ্চা নিয়ে খুব ছোট বেলা থেকেই আমরা একটা রূপকথার মত শুনেছি। ভগবান বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা মায়া দেবী স্বপ্নে দেখেছিলেন একটা সাদা হাতীর বাচ্চা আকাশ থেকে তাঁর কোলে নেমে আসছে। বৌদ্ধ ধর্মে হাতীর অনেক কথা আছে। অজন্তার গুহায় আঁকা ছদন্ত জাতকের ছবি এখনও বোঝা যায়। সেবার জলদাপাড়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত হাতীর পিঠে চেপে জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। ওখানে হাতিতে চাপার জন্য সিমেন্টের উচু প্লাটফর্ম করা আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতিতে চাপতে হয়। সেদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় আমরা আধ ঘন্টা মত জঙ্গলে ছিলাম।

জলদাপাড়ায় লোকে গন্ডার দেখতে যায়, আমরা গন্ডার দেখতে পাইনি। খুব সামান্য কয়েকটা জঙ্গলের প্রাণী দেখেছিলাম। তবুও প্রথম জঙ্গল সাফারির স্মৃতি হিসেবে ওটাই আমার মনে থেকে গেছে। পরে বেশ কিছু জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, আর কোথাও হাতিতে চাপার ব্যবস্থা দেখনি। বান্ধবগড়ে জীপে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় কিছুক্ষন নেমেছিলাম, সেখানে একটা পোষা হাতি ছিল। করবেট জাতীয় অরণ্যেও একটা হাতিশালে গোটা চারেক পোষা হাতি ছিল। ওখানে জংলী হাতি অনেক আছে শুনেছি, কিন্তু আমরা দেখিনি। উত্তর বঙ্গের জঙ্গলগুলিতেও জংলী হাতি আছে শুনেছি, কিন্তু আমরা কোনদিন দেখিনি। গয়েরকাটায় মধুবণী বাংলোয় আমরা একরাত ছিলাম; তার কদিন আগেই জংগলের হাতিরা এসে বাংলোর বেড়া ভেঙ্গে গেছে শুনেছি।

আগের দিনে পোষা হাতিদের অনেক কাজে লাগানো হত। মধ্য যুগে রাজাদের সেনা বাহিনীতে হাতি থাকত। জমিদার বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকলে সে জমিদারের মর্যাদা বাড়ত। আমার অতিশ্রদ্ধেয় মানুষ, মালদার কিংবদন্তি চোখের ডাক্তারবাবু , প্রয়াত পিনাকী রঞ্জন রায় মহাশয়ের সাথে আমার যখন আলাপ হয় তখন উনি ধর্ম প্রাণ বৈষ্ণব। কথায় কথায় বলেছিলেন, ওনাদের হরিশচন্দ্রপুরের জমিদার বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকত।

অতীনবাবু নীলকন্ঠ পাখীর খোঁজে উপন্যাসে লক্ষ্মী নামের একটি পোষা হাতীর কথা লিখেছেন। পুরনো দিনের গল্প -উপন্যাস -সিনেমায় হাতীর পিঠে চেপে শিকারের অনেক কথা আছে। কদিন আগেই দেখছিলাম, আসামের বন দপ্তরের আধিকারিক হাতীর পিঠে চেপে একটি বাঘকে ঘুম পাড়ানি গুলি মারতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সেই বাঘিনী হঠাৎ লাফিয়ে বারো ফুট ওপরে, হাতীর পিঠে বসা মহুতকে ঘায়েল করে। তার আগে কিন্তু ঐ হাতি' ওদিকে বিপদের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছিল।

গত কয়েক বছর ধরেই খবর পাওয়া যায় দলমা পাহাড়ের হাতীর দল বাঁকুড়া মেদিনীপুরের গ্রামে চলে আসছে ; কিছু কিছু হাতি এদিকে থেকেই যাচ্ছে। জঙ্গলে খাওয়ারের অভাবেই ওরা লোকালয়ে চলে আসে। জঙ্গলের হাতি লোকালয়ে চলে এলে একটা উত্তেজনা ছড়ায়। ওরা বাধ্য হয়েই চলে আসে। বিরাট কিছু বিরক্ত না করলে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় লোকে অকারণে ওদের উত্যক্ত করে, তখনই ওরা পাল্টা আক্রমণ করে।

গণেশ ঠাকুরের মাথাটি হাতীর; এ নিয়ে বেশ অলৌকিক কাহিনী আছে। এছাড়াও হাতি বিশ্বকর্মা ঠাকুরের বাহন। সাধারণত লক্ষ্মী প্রতিমার বাহন হিসেবে পেঁচা দেখা গেলেও গজলক্ষ্মীও দেখা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হাতি, কিন্তু ইন্দ্র দেবতার মূর্তি আমি কোনদিন দেখিনি।

অনেক মন্দির আর আশ্রমে হাতীর মূর্তি আছে। উনিশ শতকের আশির দশকে আমরা দিল্লিতে পরীক্ষা দিতে গেলে শ্রীনিবাসপুরীর ভারত সেবাশ্রম সংঘে থাকতাম। ঐ আশ্রমের বড় গেটের দুপাশে দুটি বড় হাতীর মূর্তি ছিল। অটো রিক্সার চালকরা

বলত হাতিওয়ালা মন্দির। অমরকন্টকের নর্মদা মন্দিরের সামনে একটি ছোট পাথরের হাতি আছে। লোকেরা ঐ হাতির পেটের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পেরনোর চেষ্টা করে। পেরোতে পারলে তার ভাগে একটু বেশী পূণ্য জমা হয়।

হাতি মেরে সাথী সিনেমার হাতি সে সময় খুব বিখ্যাত হয়েছিল। বিভিন্ন সিনেমা উপন্যাসের হাতিদের এক একটা নাম খুব বিখ্যাত হয়ছে। ঐরাবত হাতির নামটা খুবই বিখ্যাত। কিন্তু মহাভারতের সেই হাতিটি ভীমের গদার আঘাতে মরেও অমর হয়ে যায়। কি নাম সে হাতীর? মনে পড়ছে না তো? কিন্তু আমি নিশ্চিত, আপনাদের সবার মনে আছে। সেই যে, “অশ্বত্থমা হত , ইতি গজ।“

হাদু মাছ

ভূত চতুর্দশীর দিন , ভূত নিয়ে আলোচনায় ভূতেদের পছন্দের জিনিস হিসেবে , হাদু মাছ দিতে চাইলাম। এই হাদু মাছ কি ? সেটা জানতে হলে আমার একটু পুরনো গল্প বলতে হয়। না , ভূতের গল্প নয়। বাৎসল্য রসের গল্প। আমার ছেলের তখন বছর তিনেক বয়স। বাসায় খুব নেংটি ইঁদুরের উৎপাত। একটা ইঁদুর ধরা কল কিনে আনলাম। যদিও রসিকজনে বলে " ইঁদুর ধরা কল রয়েছে জগৎ মাঝারে" ; এ কল সে কল নয়। এ একেবারেই একটা লোহার তারের খাঁচা। ভেতরে খাওয়ার দিয়ে রাখলে , ইঁদুর ঐ খাওয়ার খেতে ঢুকে আটকা পড়ে।

আমি আর আমার ড্রাইভার ছেলেটি , সন্ধ্যে বেলা, ঐ কলে টোপ আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। আমার ছেলের বিপুল আগ্রহ। ও এসে আমার গা ঘেঁসে বসে দেখছে। টোপ হিসেবে কিনে এনেছিলাম, ছোট শুঁটকী মাছ। ড্রাইভার ছেলেটা একটু ফাজিল ছিল। আমার ছেলে , এটা কি , ওটা কি এরকম নানা প্রশ্ন করছিল। ড্রাইভার হঠাৎ করেই একটা শুঁটকী মাছ আমার ছেলের নাকের কাছে তুলে ধরে। বিকট দুর্গন্ধটাকে আমার ছেলে বলেছিল " হাদু মাছ" ! অর্থাৎ হাগু মাছ।

শুঁটকী মাছের গন্ধকে হাগুর গন্ধের সাথে তুলনা করলে, যারা শুঁটকী পছন্দ করে তাদের আপত্তি হবেই। কিন্তু ঐ তিন বছর বয়সের বাচ্চাকে তো আমরা কেউ শেখাইনি; ও নিজেই বলেছে , হাদু মাছ।

আমার একমাত্র মামীমা শুঁটকীর খুব ভক্ত। কম বয়সে মাঝে মাঝে মামা বাড়ী গিয়ে দেখতাম, মামীমা শুঁটকী মাছ রান্না করে , পরম তৃপ্তির সাথে খাচ্ছেন। আমার তো গন্ধে প্রাণ বেরিরে যেত। বারাকপুরে ভাড়া বাড়ীতে থাকার সময় , আমাদের বাসার জানালার বাইরেই পাশের বাড়ীর রান্না ঘর ছিল। মাঝে মধ্যে ওরা যখন শুঁটকী রান্না করত, আমাদের প্রায় বাড়ী ছেড়ে দৌড়ে পালানোর অবস্থা হত।

ন্যাশনাল হাইওয়েতে বাসে যাওয়ার সময় কয়েকবার বিকট দুর্গন্ধবাহী ট্রাকের পিছনে পড়তে হয়েছে। বাসের যাত্রীরা "শুঁটকীর ট্রাক" বলে চিৎকার করত, আর বাসের ড্রাইভারকে বলত, তাড়াতাড়ি চালিয়ে পেরিয়ে যেতে।

শুঁটকির আর একটা মারাত্মক দিক দেখেছিলাম , উত্তর বঙ্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করার সময়। বন্যা হল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথম দিন থেকেই সাজ সাজ রব। ফিল্ডের স্টাফরা খুব ছোটা ছুটি করে , হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ও আর এস ইত্যাদি বিতরণ করল। বিপদটা শুরু হল জল নামতে শুরুকরার সময়। বন্যার মত রুগী আসতে শুরু করল। সব চালধোয়া জলের মত পায়খানা আর বমি। দশ বারো দিনে হাজার বারোশ রুগী ভর্তি হয়েছিল। জেলার ষ্টোরেও স্যালাইনের ঘাটতি হয়ে গেল। ভালোর মধ্যে খবর হল , মাত্র তিন জন রুগী মারা গিয়েছিল।

এত রুগীর কারণ কি ? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল ভয়ংকর খবর। বন্যার জল নামার সময় মাঠে প্রচুর চুনা মাছ ধরা পড়ছিল। এত মাছ ভেজে খাওয়ার মত তেল কেনার পয়সা ছিল না। মাছগুলিকে পিচ রাস্তায় ফেলে শুকানো হয়েছে। তারপর মাটির খোলায় ভাজা করে , হামানদিস্তায় গুড়ো করে , কচু সেদ্ধর সাথে মেখে খাওয়া হয়েছে। হাগু মাছ যে হাগুকে একেবারে চালধোয়া জলের মত করে দেবে, এটা আমদের কারোরই জানা ছিল না। আর দুর্গন্ধর কথা যখন লিখেইছি , এই চালধোয়া জলের মত হাগুর বিশেষ গন্ধের কথাই বা বাদ দিই কেন। গোটা হাসপাতাল চত্তর একটা আঁসটে গন্ধে ভরে গেল। এমনকি আমাদের গায়েও সে গন্ধ লেগে থাকত।

যে ছবিটা সঙ্গে দিয়েছি , ওটা বছর দুই আগে ফ্রেজারগঞ্জে তোলা। সমুদ্রের বালুকাবেলায় প্রায় মাইল খানেক জায়গা জুড়ে মাছ শুকাচ্ছে দেখেছি। ভয়ে ওর সামনে যাইনি।

শুঁটকির ভক্তদের বিরাগভাজন হই কেন ; একটু ভালো খবর দিয়েই শেষ করি। আমার কলেজের একবছরে বড় দাদা ছিলেন , মণিপুরের ডা শ্যাম কুমার সিং। এখন পি জি আই চন্ডিগড়ের হার্টের সার্জারী বিভাগের প্রধান। বেশ কয়েকটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন। শ্যামদা একবার মণিপুর থেকে শুঁটকী মাছ ভাজা এনেছিলেন। আঙলের মত সরু সরু , শুকনো লংকা ভাজার মত মুড়মুড়ে। আমরা কয়েক মিনিটেই একটা দুটো করে খেয়ে শেষ করেছিলাম। এমন অপূর্ব স্বাদের মাছভাজা আর কোনদিন পাইনি।

Fish Drying - Frezergunj

হোস্টেল

উনিশশ' আটাত্তর সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর সকালে কলকাতার ধর্মতলা থেকে সরকারী বাসে রওনা দিলাম বাঁকুড়া। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে চললাম। সাথে একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স। ওখানে গিয়ে হোষ্টেলে থাকতে হবে। জীবনে প্রথম কোন হোষ্টেলে থাকতে যাচ্ছি। আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন বাঁকুড়ার নারায়ণ দাদা। বিষ্ণুপুরে বাস পাল্টে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কলেজে পৌঁছলাম। আপিসে গিয়ে শুনি ঐ দিন প্রিন্সিপাল স্যার নেই, ভর্তির জন্য পরদিন যেতে হবে। একটা রিক্স নিয়ে দাদার পরিচিত একজন পুরনো ছাত্রের সাথে দেখা করতে রবীন হল হোস্টেলে গেলাম। দেখা হল তার সাথে। কিন্তু জানলাম ওটা পাশ করে ইন্টার্ন থাকার সময়ে থাকার হোস্টেল। আমাদের নতুনদের পুরনো মেইন হোস্টেলে থাকতে হবে। আবার রিক্সা নিয়ে চললাম, এক মাইল দূরের সেই মেইন হোস্টেল। প্রায় বিকেল হয়ে গেল। (৩৯ বছর পরে আমার ছেলে এই রবীন হলে থেকেছে; তিন বছর।)

রবীন হল

রবীন হল একটা চার তলা বাড়ী, আর এই মেন হোস্টেল একতলা ব্যারাকের মত টানা , টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ী। খোঁজ করে হোস্টেলের মনিটর -এর সাথে দেখা করলাম। উনি একজন পুরোনো ছাত্র। পরে জেনেছি আমার থেকে দু'বছরের বড়। আমরা শ্যামাদা বলতাম। শ্যামাদা জানালেন, হোস্টেলে ঘর খালি আছে, কিন্তু ভর্তির আগে তো থাকা যাবে না। আমার দাদা যখন শ্যামাদার সাথে কথা বলছিল, আমি পাশেই দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিলাম। একজন লোক বারান্দার ধারে বসে গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজছিল। তার দিকে তাকাতেই ঘুশি বাগিয়ে দেখাল। তখনকার দিনে কলেজের হোস্টেলে রাগিং হত , আগেই শুনেছি। বিশেষ করে আই আই টি হোস্টেল গুলিতে মারাত্মক রাগিং হয় জানতাম। ঐ ঘুষি দেখানোর কায়দায় বুঝলাম এখানেও রাগিং হয়। মজার কথা হল, পরে হোস্টেলে থাকার সময় মাস দুই খুব রাগিং হলেও, ঐ গুড়াকু দাদা কোনদিন রাগিং করেনি।পরদিনই কলেজে ভর্তি হওয়ার পর

আবার সেই মেইন হোস্টেলে গিয়ে বাক্স রেখে এলাম। বোধ হয় দিন দশেক পর থেকে শুরু হল আমার হোষ্টেল জীবন। প্রায় নয় বছর ছিলাম বাঁকুড়ায়। সব মিলে তিনটি হোস্টেলে। সেই সব দিন যেন স্বপ্নের মত মনে হয় এখন।

আমি স্কুলে পড়ার সময় কখনও হোষ্টেলে থাকিনি। আমার কলেজের বন্ধুদের কেউ কেউ স্কুলে পড়ার সময় হোস্টেলে থেকেছে। ওদের কাছে গল্প শুনেছি। আমাদের গ্রামের স্কুলের হোস্টেল বলে যেটা ছিল, আমরা তাকে বোর্ডিং বলতাম। চার –পাঁচ জন শিক্ষক আর মাত্রই জন তিনেক ছাত্র থাকত তখন। দূরের থেকে প্রতিদিন আসা যাওয়া করে স্কুলের কাজ করার সুযোগ যে শিক্ষকদের ছিল না তাঁরাই বোর্ডিং –এ থাকতেন। ঐ শিক্ষকদের কারো ভাগ্নে বা ভাইপো এরকম কয়েকজনই বোর্ডিং এ থাকত। ওরা আমদের গ্রামেরই ছেলে হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সাথেই বিকেলে খেলত। সে বোর্ডিং উঠে গেছে বোধহয় বছর কুড়ি। পরে স্কুল লাগোয়া একটা হোস্টেল হয়েছে, অনেক ছাত্র থাকে শুনেছি।

আমদের গ্রামের থেকে তিন মাইল দূরে একটা বড় স্কুল বহু বছর ধরে আছে। ঐ স্কুলের হোষ্টেলও বহু পুরনো। একবার রাত্রে সেই হোস্টেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বাঁকুড়ার হোস্টেলে থাকতে ,একটা চিঠিতে বাড়ি থেকে একটা খারাপ খবর পেয়ে দুপুরের পর রওনা দিলাম। বাস পাল্টে আমদের গঞ্জের নদীর পাড়ে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকার রাস্তায় পাঁচ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি; হাঁটতে শুরু করলাম। অন্ধকারে তবু হাঁটা যায়, কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি মাথায় তো আর এগোতে পারছি না। কি মনে করে ঐ স্কুলের হোস্টেলে ঢুকলাম, যদি চেনা কোন ছাত্র থাকে, একটা ছাতা পেতে পারি। একজন চেনা ছেলেকে পেয়েও গেলাম। আমার স্কুলের বন্ধুর ভাই। ছাতা হয়তো ও একটা জোগাড় করে দিতে পারে, কিন্তু ঐ রাত্রে সে আমাকে ছাড়তে চাইল না। ওদের হোষ্টেলের স্যারকে বলে আমাকে রেখে দিল। একটা বড় হল ঘরে দশ বারো জনের আলাদা আলাদা মাদুর পাতা, মেঝেতে। ঐ ভাইয়ের সাথে থেকে গেলাম। রাত্রে আলুর ডাল আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠে বাড়ী গেলাম। পরে আর একবার বাঁকুড়ার গ্রামের এক স্কুলের হোষ্টেল স্লান করতে ঢুকেছিলাম, এক শীতের দুপুরে, চক্ষু পরীক্ষা শিবির করতে গিয়ে।

আমাদের রাজ্যেই কয়েকটি স্কুলের হোষ্টেল খুবই বিখ্যাত। একটি ধর্মীয় সংস্থার পরিচালিত স্কুলের হোষ্টেল এতই নামকরা ,যে বাবা মায়েরা স্বপ্ন দেখে তার ছেলে ঐ হোস্টেলে থাকবে। কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিততে পারলে জীবন তৈরী হয়ে গেল। আমার মনে হয়েছে, এত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে জিততে পারে সে এমনিতেই উচ্চ মেধার ছাত্র। অসৎ সঙ্গে উচ্ছন্নে না গেলে তাকে আটকে রাখা যায় না। আমার কলেজের বন্ধুদের মধ্যে যারা ঐ রকম বিশেষ স্কুলের হোষ্টেল –এ থেকে এসেছে, তাদের কোনভাবেই আলাদা মনে হয়নি। ওদের কাছেই ওদের হোষ্টেলের গেরুয়া পোষাক পরা শিক্ষকদের নানান দূর্নীতির কথা শুনে খারাপ লাগত। ঐ সব হোস্টেলে থাকলে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হবে, তারা অন্যদের থেকে বেশী শৃঙ্খলা পরায়ণ হবে,

এটাই প্রচার। আমার কপাল পোড়া, তেমন একজনকেও দেখিনি। যারা সারা জীবন বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ার পর আমাদের সাথে কলেজের হস্টেলে থেকেছে, তারা সব বেয়াড়া হয়েছে? আমি তো তেমন দেখিনি।

স্কুলে পড়ার সময় বাচ্চাগুলোকে হস্টেলে রাখার পিছনে কয়েকটি কারন থাকে। এক যেমন বলেছি , ধর্মীয় সংস্থার হোস্টেলে থাকলে নৈতিক চরিত্র উন্নত হবে , এমন একটা ধারনাই প্রধান। অনেক বিত্তবান মানুষ বাচ্চাদের হোস্টেলে রাখেন, কারন তারা নিজেদের উপরই ভরসা রাখতে পারে না। পারিবারিক সমস্যা থাকলেও ছোট বাচ্চার মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে, এই আশঙ্কা করে অনেক বাচ্চাকে হোস্টেলে রাখা হয়। অনেকের ধারণা হোস্টেলে থাকলে বাচ্চা অনেক বেশি স্বনির্ভর হবে। আমাদের বাচ্চারা স্কুল কলেজ জীবনে হোস্টেলে থাকেনি, তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করছে। বাবা মা কেমন করে বাচ্চাকে মানুষ করছে তার উপরই এসব নির্ভর করে। স্কুলের হস্টেলের সাথে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যলয়ের হোস্টেলের অনেক তফাৎ আছে। স্কুলের ছেলেদের যেমন সব সময় “পড় পড়” বলতে হয় , কলেজে তার দরকার হয় না। বলার মত কেউ থাকেও না। পড়াটা যে নিজের তাগিদেই করতে হয় এটা কলেজের পড়ুয়ারা যেমন বোঝে , স্কুলের ছাত্রদের কাছে সেটা আশা করা যায় না। আবার কলেজের ছাত্র –ছাত্রীদের রাজনৈতিক বা অন্য নানান বিপজ্জনক বদ সংসর্গে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আমি কয়েকজনকেই কলেজের হোস্টেলে বাজে নেশার কবলে পড়তে দেখেছি। আর আমাদের সময়কালে যে কটা বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন হতে দেখলাম , সব কটাতেই দেখেছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অগ্রনী ভুমিকা নিয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্যার জল মেডিক্যাল কলেজগুলির হস্টেলেও সমানভাবে ঢুকেছে। এই বাবদে আমাদের রাজ্যের আর দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বেশ বিখ্যাত হয়েছে। কলকাতার এক একটা মেডিক্যাল কলেজের চার পাঁচটি করে হোস্টেল। এগুলির এক একটি আবার এক এক রাজনৈতিক দলের আখড়ায় পরিনত করা হয়েছে।

গত বছর সাত আটেকে প্রায় সবকটা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়েছে; ফলে হোস্টেলে থাকার জায়গার অভাব। কোলকাতার আশেপাশে যাদের বাড়ি তাদের হোস্টেলে জায়গা দেওয়া হয় না। অনেক বাবা মা আবার ঐ রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে ছেলে মেয়েকে দূরে রাখতে চান বলে নিজেদের সন্তানকে হোস্টেলে পাঠাচ্ছেন না। আমরা বাঁকুড়ায় থাকার সময় যাদের বাড়ি বাঁকুড়া শহরে তারাও হোস্টেলে থাকত; হোস্টেলে থাকলে বন্ধুদের সাথে পড়াশুনা ভালো হত। আমরা তখন হোস্টেলের যে ঘরে একা একা থেকেছি এখন সে সব ঘরে দুজন , এমনকি তিনজনকেও থাকতে হচ্ছে। আমার ছেলে এম ডি পড়তে গিয়ে প্রথমে হোস্টেল পায়নি; কদিন বাইরে লজে থাকতে হয়েছে। ওরা যাওয়ার আগেই এ খবরটা জেনে গিয়েছিল; তাই পৌছে ঝামেলায় পড়েনি।

Dr B C Roy Hall in 2018.

2015 বাঁকুড়ায় আমার দ্বিতীয় হোষ্টেল

আমার মেয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দিল্লি এন আই টি বিপজ্জনক ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখিয়েছে। এম টেকে ভর্তি হওয়ার সময় হোস্টেলের ফি কত জানতে চাইলে বলেছে, ক্লাশ শুরু হলে তখন হোস্টেল পাবে, ফি তখনই দিতে হবে। এত বড় একটা কলেজে যে মেয়েদেরও হোস্টেল নেই এটা আমরা ভাবতে পারিনি। নেই যে সে কথাটা প্রথমেই বলে দিতে পারত। একমাস পর দু হাতে দুটি বড় ব্যাগ নিয়ে কলেজে পৌঁছেই শুনল , কোন হোস্টেল নেই। কলেজের কাছের বাজারটি কলেজ থেকে দু কিলোমিটার দূরে। আপিস থেকে নির্বিকার ভাবে বলে দিল, পেয়িং গেস্ট খুঁজে নাও। যেন মুদি দোকান থেকে সাবান কিনতে বলছে। মেয়ে কেঁদে ফেলেছে। তখন দয়া করে একটা হোস্টেলের গেষ্ট রুম দুদিন থাকতে দিয়েছে। এই মেয়ে কিন্তু স্কুল কলেজ কোথাও হোস্টেলে থাকেনি। নিজে নিজেই পেয়িং গেস্ট খুঁজেও নিয়েছে। কিন্তু সেই যে কলেজ সম্বন্ধে একটা অনাস্থা ওর তৈরী হল সেটা ওর আজীবন থেকেই যাবে।

বাঁকুড়া শহরে বহুদিন থাকলেও বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের কোন হোস্টেলে কোনদিন ঢুকিনি। বছর দুই আগে , বিখ্যাত প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড এ ই ব্রাউন সাহেব আর তাঁর অলিম্পিক পদক বিজয়ী ছেলে মেয়ের কথা জানতে পারি। (তুমি বিদেশীনি নিবন্ধে লিখেছি) আগেই শুনেছি ব্রাউন হোস্টেল আর মিচেল বা মাইকেল হোস্টেলের কথা। এক বন্ধুর সাথে গেলাম সেই ব্রাউন হোস্টেল দেখতে। হোস্টেলের সামনের সেই দীঘি এখনও আছে, যদিও বাঁধানো ঘাটের অবস্থা কাহিল। এত বিখ্যাত সব মানুষদের স্মৃতিধন্য হোস্টেল দেখলাম। অবশ্যই তাঁরা এ দেশ ছেড়ে যাওয়ায় পরই তৈরী হয়েছে ঐ হোস্টেল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ল আমাদের কলেজ জীবনে ঐ হস্টেলগুলিতে ঘটে যাওয়া একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা। দুই হোস্টেলের মধ্যে মারামারিতে খুন হয়ে যায় খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র নেতা সুদেব ঘটক। তাকে কোনদিন দেখিনি। কলকাতার বিখ্যাত সব হোস্টেল, বেকার- কারমাইকেল- হিন্দু দেখেছি। পিজি হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তারদের হোস্টেলে কিছুদিন থাকার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তবুও কলেজের হোস্টেল বললেই চল্লিশ বছর আগে ঘটা, সুদেব ঘটকের হত্যার কথাই কেন মনে পড়ল জানিনা।

বাঁকুড়ায় আমার শেষ হোষ্টেল

লক্ষ্মী দিদি

আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশের বাড়ীতে থাকতেন আমাদের লক্ষ্মীদিদি। থাকতেন বলাটা ঠিক হলনা; ওনারাই আমাদের প্রতিবেশী। মাঝে আর একটা বাড়ী থাকলেও, এই দিদিদের সাথেই আমাদের বাড়ীর যোগাযোগ বেশী ছিল। এই দিদি যে কোন সুবাদে আমাদের দিদি হয়েছিলেন, আমার জানা নেই। আমি জন্মে থেকেই জানি, লক্ষ্মীদিদি আমাদের আপনজন। একেবারেই চাষি পরিবারের গৃহিণী। ওনার নিজের ছয় ছেলে, আর ভাসুরের তিন ছেলে মিলে বিরাট পরিবার। নিজেদের চাষের জমি ছিল, তাতে ছেলেরা প্রচুর পরিশ্রম করত। দিদির বড় আর মেজ ছেলে আমার থেকে বয়সে বড় ছিল। আমরা ওদের দাদাই বলতাম। তবে, পরের দিকে আমি ডাক্তার হওয়ার পর , ঐ দুজনও আমাকে মামা বলত। এই মামা বলা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমি তখন মেদিনীপুর শহরে থাকি। দিদির মেজ ছেলে আর গ্রামের আর এক প্রতিবেশী আমার বাসায় এসেছেন। আমার কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে , আমার স্ত্রী আমাদের গ্রামের লোকজনকে চেনার কথাও নয়। ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে , চা খাওয়াতে বললাম। দুজন বয়স্ক মানুষ , " মামী" বলে পায়ের ধুলো নিতে চাইলে আমার স্ত্রী দারুন বিব্রত হয়েছিল।

গ্রামে যতদিন ছিলাম দিদিদের বাড়িতে প্রায় সবদিনই কোন কাজে বা খেলতে যেতাম। ওনার সেজ ছেলে আর তার পরের দুই ভাই, ওদের জেঠার দুই ছেলে , সব আমাদের খেলার সঙ্গি ছিল। একমাত্র ঐ বাড়িতেই আমরা রান্না ঘরেও ঢুকে যেতাম। ওদের অনেক আম গাছ আর গোটা দুই বিশাল কতবেল গাছ ছিল। ফল পাকার সময় সারাদিন ঐ সব গাছের তলায় ঘুরে বেড়াতাম।ওদের পুকুরটাও বেশ বড় আর গভীর ছিল, গ্রীষ্মকালে অনেক জল থাকত। আমরা বেশ কিছু ছেলে দুপুরে পুকুরে নেমে জল তোলপাড় করতাম। পুকুরের পাড়ের উপর ছিল একটা বিরাট ঝাঁকড়া আম গাছ। তিন ভাগ আম জলেই পড়ত, আমরা ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে আম তুলতাম।

আর ছিল একটা তেঁতুল বাগান। গোটা দশেক বিরাট বিরাট তেঁতুল গাছের এমন বাগান আমি আর কোথাও দেখিনি। গ্রীষ্মের দুপুরে ঐ বাগানে আমাদের আড্ডা বসত। ঐ আড্ডাতেই লক্ষ্মী দিদির বাছাই করা গালাগালি সব শিখেছিলাম। পাড়ার কোন মেয়ে বৌ কুঁড়ে হলে তার উদ্দেশে দিদি বলতেন, “ওর গতরে লাথ মার! " অর মুয়ে ঝাঁটা মার" ছিল দিদির সবথেকে কড়া গালাগালি। তখনকার গ্রামের সব মহিলার মত দিদিও প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানতাম উনি খুব বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। আমার মাকে দেখেছি, কোন সমস্যায় পড়লে , দিদিকে ডেকে পরামর্শ নিচ্ছে। আমার নিজের বড়দি মাঝে মাঝে গ্রামের আর দুই মহিলার সাথে গরুর গাড়ী করে সিনেমা দেখতে যেত। তখন লক্ষ্মী দিদি সিনেমায় গেছেন, এমন শুনিনি। কিন্তু মাইল দুই দূরের হাটে নিয়মিত যেতেন। খুব সামান্য কিছু সব্জি বা ফল নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতেন। কিন্তু হাটে যাওয়াটা ওনার নেশার মত ছিল।

দিদিকে নিয়ে প্রথম যে স্মৃতি আমার আছে সেটা হল একটা দশ কেজি ওজনের কাতলা মাছ কাটা।অনেক দিন

পর বন্যা হয়ে মাঠ ঘাট পুকুর সব ভেসে গেল। ধানের মাঠে বড় বড় রুই কাতলা মাছ এসে গেল। বড়দা আর তার বন্ধুরা বন্যার জলে জাল ফেলে অনেক মাছ ধরল। বড়দার ধরা বিরাট কাতলা মাছ কাটবে কে। লক্ষ্মী দিদির ডাক পড়ল। দিদি তার

ভারী চেহারা নিয়ে উঠানে বসে মাছটাকে কাটলেন। আর শেষ দিদিকে দেখেছি চোখের ডাক্তার হিসেবে।তখন দিদির বেশ বয়স হয়েছে। কোথাও একটা ছানি অপারেশনের করিয়েছেন, কিন্তু তারপর থেকে চোখে একটা অস্বস্তি । আমি তখন মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি যেতাম। একবার গ্রামের বাড়িতেই দিদিকে দেখলাম। অপারেশন-এর একটা জটিলতা হয়েছিল, ওখানে বসে খালি হাতে আমার কিছুই করার ছিলনা।

ছোট বেলা থেকেই দিদিকে প্রায় বাড়ীর লোকের মতই দেখে এসেছি। দুই বাড়ীর উৎসব অনুষ্ঠানে, বিপদে আপদে সবাই নিজের মতো পাশে থাকতাম। লক্ষ্মীদিদি আর মা আমাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে, মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এই দৃশ্যটাই আমার মনে জেগে আছে পরিষ্কার ভাবে। ওদের কান্নার কারণটাও ছিল অদ্ভুত। সকালের দিকে আমাদের একটা গাই গরু হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। দাদা কি করে যেন বুঝেছিল, সাপে কামড়েছে। তাড়াতাড়ি গরুর বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। আমাদের চোখের সামনে মরে গেল গরুটা।

গ্রামের এই সব লক্ষ্মীদিদি, মিত্রা মাসি, বড় বৌদি এদের স্নেহে শাসনে বড় হয়েছি। ওদের বাড়ীর আমগাছ পেয়ারা গাছ গ্রামের সব বাচ্চাদেরই নিজের মনে হত। পরের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অনেকে আমাকে দেখেইনি কোনদিন। গত পঁচিশ বছর বোধহয় লক্ষ্মিদিদির বাড়ীর দিকে যাই নি। এখন যেতে গেলেও মনে একটা আশংকা থেকে যায়। ওদের পুকুরের ঈশান কোনের সেই বড় কতবেল গাছটা কি আর এখনও আছে? যদি না থাকে? শৈশবের হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর মত আর একটা শুন্যতা মনটাকে খারাপ করবে।

বড় বৌদি

১৭.১.২০২৫। যে ভয়টা মনে ছিল, সেটাই সত্যি হল; দেখে এলাম, আমাদের কৈশোরের স্মৃতিমাখা সেই কতবেল গাছ, তেঁতুল গাছগুলি, আম গাছগুলি কেউ নেই। মানুষের জন্য তারা সবাই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

নাম করণের সার্থকতা।

আমার এক নিকট আত্মীয়ার নাম, লোপামুদ্রা। ঐ নাম তথা আত্মীয়ার সাথে আলাপ হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পর জানতে পারি যে, এই লোপামুদ্রা নামের এক বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাহিনী মহাভারতে আছে। একই রকম ভাবে বছর আঠারো আগে, এক আত্মীয়ের ছেলের নাম শৌনক, জানার পর , এই শৌনক মানে কি, বা এ নাম কোথা থেকে এল ভাবতে ভাবতেই , সম্ভবত পরের দিনই একটা লেখায় চোখে পড়ে শৌনক নামটা। আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান"- এ দেখলাম ঐ শৌনক মুনির নাম। মহাভারতে কি নেই , তাই ভবি।

আমরা স্কুলে বাংলা পড়ার সময় যে সব গল্প বা কবিতা পড়তাম, তাদের 'নাম করণের সার্থকতা' বলে একটা জিনিস আমাদের জানতে হত। অমুক লেখকের তমুক গল্পের নাম করণের সার্থকতা লিখ; এরকম একটা প্রশ্ন আসত পরীক্ষায়। আমরা বুঝি না বুঝি, একটা দশ লাইনের মত উত্তর মুখস্ত করতে হত। আর নাম নিয়ে ছিল দু' একটা প্রচলিত বাকধারা। নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। আর একটা ছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। তাল পুকুর আমি বেশ কয়েকটা দেখেছি, কিন্তু ঘটি না ডোবার মত দুরবস্থা কোনটার দেখিনি। আর চোখের ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অনেক কানা লোক দেখলেও তাদের কারো নাম পদ্মলোচন পাইনি।

আবার কদিন আগে মহাভারতের এই শৌনক মুনির প্রসঙ্গ বিস্তৃত শুনলাম। তখন আমার ঐ আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলের শৌনক নাম কে রেখেছে? ওরা এই শৌনক মুনির কথা জানে কি না? ছেলের নাম তার বাবাই রেখেছে, জানাল। এই নামে একজন মুনি ছিলেন, এটুকুই জানে, আর কিছুই জানা ছিল না। ওকে মহারাজ সমর্পনানন্দর মহাভারত পাঠের ইউ টিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলাম।

মহাভারতের ঐ গল্পটা একটু বলি। পাণ্ডবরা বনবাসে যাওয়ার সময় অনেক ব্রাহ্মণ তাঁদের সাথে সাথেই বনে চলে গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্মলোচনা শুনে সময় কাটাতেন। স্বনামধন্য ধার্মিক হাওয়ার সুবাদে , মাঝে মাঝেই নতুন নতুন ব্রাহ্মণ, মুনি- ঋষি এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাথে শাস্ত্র আলোচনা করে যেতেন। এ ভাবেই একদিন বিখ্যাত শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তখনও বনবাসের বেশী দিন হয়নি। রাজা থাকার সময়ে যেমন করেছেন, তেমনি ভাবেই যুধিষ্ঠির, সাথে আসা ব্রাহ্মণদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বনবাসের সময় এত মানুষের ভরণ পোষণের ক্ষমতা পান্ডবদের ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ দের অযত্ন হচ্ছে বুঝে মনে

মনে বেশ কষ্টও পাচ্ছিলেন। সেই রকম একটা দিনই মহাত্মা শৌনক মুনি সেখানে আসেন। এই শৌনক মুনির উল্লেখ ' প্রশ্নোপনিষদে ' আছে। কয়েকজন মুনি- ঋষি এই শৌনক মুনির কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলে , শৌনক মুনি তাঁদের বলেন যে, অন্তত একটি বছর আমার আশ্রমে থাকুন, তপস্যা করুন; তারপর আপনাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে কি না বুঝে, আপনাদের প্রশ্ন শুনব। এই প্রশ্ন করার অধিকার নিয়ে , সমর্পনানন্দ মহারাজ বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন। আমার মত অনধিকারির কাছে সেসব কথা না শুনে , সরাসরি মহারাজের পাঠ থেকেই শুনুন।

যাই হোক, রাজ চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, সেই নিয়েই শৌনক মুনি বিস্তৃত আলোচনা করলেন। মুনি বলেছিলেন, " শোক স্থান সহস্রানি, ভয় স্থান শতানী চ।" অর্থাৎ মানুষের শোক দুঃখের হাজার কারণ হয়, আর ভয় পাওয়ার মত একশোটা জিনিস আছে।এই শৌনক মুনি কর্ম যোগ আর সাংখ্য যোগ এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রাজ্য হারানো, বনবাসী যুধিষ্ঠিরের শোকের কারণ তো খুবই প্রকট। তারপরও তিনি তখনও নিজের বনবাস জীবনের সীমাবদ্ধতাকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি; আগের মতোই শত শত ব্রাহ্মণের সেবা যত্ন করে যেতে চাইছেন। সেটা ঠিক মত করতে না পারাটাও তাঁর শোকের আর একটা কারণ। স্পষ্টবাদী শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরকে বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করে দেখলেন যে, রাজার সেই রাজসিক মানসিকতা তখনো থেকে গিয়েছে। এখানে যেন ব্যতিক্রম হিসেব দেখা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ মুনির কথা মানতে পারছেন না। শৌনক মুনি একটু হতাশ হয়েই যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমার আত্মীয় এই শৌনক ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওর বাবা মা কোনদিনই ভাবেনি যে তাদের ছেলে একজন দার্শনিক হোক। একই ভাবে এ দেশের লাখ লাখ ডাক্তারের মধ্যে কারো নাম চরক বা সুশ্রুত কোনদিন শুনিনি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি দশরথ নামও প্রচুর শোনা যায়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা নাম বাঙালিদের মধ্যে বিরল হলেও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম, অর্জুন, নকুল নাম আমাদের আশেপাশে অনেক দেখা যায়। সহদেব নামটি খুব প্রচলিত না হলেও আমার পুরনো স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মশাই এর নাম সহদেব। যুধিষ্ঠির নামের একজন ডাক্তারবাবু আছেন আলিপুদুয়ারে; আমার সাথে ভালো পরিচয় আছে। এছাড়া আর কোন যুধিষ্ঠির

নামের কারো কথা মনে পড়ছে না। সেদিন ভাষাবিদ ডা পাত্র বলছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কারো নাম দেখা যায় না। অবশ্য দুর্যোধন নাম আমি শুনেছি।দ্রৌপদী আর কুন্তী নামও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। আরও প্রাচীন মুনি ঋষি দের নামও কয়েকটি এখনও বেশ আধুনিক নাম হিসেবেই প্রচলিত। উপমন্যু, উদ্দালক, প্রচেতা , অরুন্ধতী এসব তো বেশ আধুনিক নাম। এমনকি একলব্য নামও শুনলাম। কিন্তূ আমার আত্মীয় ঐ শৌনক এর মতই, শুধুমাত্র সুন্দর ছন্দোময় একটা নাম হিসেবেই সম্ভবত এসব নাম রাখা। ঐ সব বেদ উপনিষদের মুনি -ঋষি, তপস্মিনীদের মত নাম রাখার সময় কজন মনে রাখে ঐরকম নাম করণের সার্থকতা?

সামান্য ফলের বিপুল সম্ভাবনা

সকালে উঠে পাড়ার মধ্যেই হেঁটে ঘুরে আসি , মাইল দুই হবে। সে প্রায় বছর পাঁচ ছয় হবে। বছরে যদি মোটামুটি সাড়ে তিন'শ দিন হাঁটা হয় , পাঁচ বছরে সাড়ে সতেরশত বার এই গাছটার নিচে দিয়ে আমরা হেঁটেছি। এতদিন খেয়াল করিনি, এর তলায় এত ফল পড়ে থাকে। এর থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ এগোলেই একটা বিরাট ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ আছে; সেটার তলায় প্রায় সারা বছরই কিছু ফল পড়ে থাকতে দেখি। আর এই অশ্বত্থ গাছের ঠিক পশ্চিমে, পঞ্চাশ গজ দূরে, আমাদের সেই খুব চেনা হরবড়ই গাছটি। এই হর্বড়ই গাছ, আর এর ফল নিয়ে আগে লিখেছি। এই সবকটি ফলের মধ্যে এই বট গাছের ফল সবথেকে সুন্দর। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে থাকা অবস্থায় অক্ষত বটের ফল প্রায় দেখাই যায় না। কদিন ধরে দেখছি, এই পুকুর পাড়ের বট গাছের নিচের রাস্তায় অসংখ্য ফল পড়ে থেঁতলে আছে। পড়ার সময় হয়তো সবকটা ফল ফেটে যায় না, কিন্তু রাস্তাটা বেশ ব্যস্ত। গোটা ফল পড়লেও মানুষের পায়ের চাপে, গাড়ী আর রিক্সার চাকায় থেঁতলে যায়। আজই, দ্বিতীয় বার ওখান দিয়ে হাঁটার সময় দেখলাম, রাস্তার পাশের দিকে , দুই একটা গোটা ফল পড়ে আছে। আসলে বটের ফল কেউ খায় না (?), বা এই ফল নিয়ে কোন কাজে লাগানো যায়, এমন খবর আমার জানা নেই। সে জন্যেই, যতো সুন্দর দেখতেই হোক , কেউ বটের ফল কুড়িয়ে নিয়ে যায় না। সুন্দর দেখতে বলেই একটা লাল টুকটুকে ফল কুড়িয়ে নিলাম। হাতে নিয়ে দেখলাম, বেশ নরম, একটু চাপ পড়লেই ফেটে যেতে পারে। একটু সাবধানেই বাড়ীতে আনতে হল। সাবধানে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেখি, এটা আরও সুন্দর লাগছে।

বট ফল

গাছের তলায় অত্যন্ত অবহেলায়, মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে পড়ে থাকতে দেখে, মনে কতগুলি ভাবনা এসে জড়ো হয়েছে। এই একটি লাল ফলের মধ্যে প্রায় শ খানেক হলুদ বীজ। সাধারণ সর্ষে দানার থেকেও ছোট এক একটি বীজের মধ্যে কী বিশাল বিপুল একটি মহীরুহের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ব্যতিক্রমী, ইতিহাস হয়ে যাওয়া গাছগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, এদিক ওদিক হেলায় দাঁড়িয়ে থাকা এক একটি বট গাছের কী বিশাল চেহারা। কোন একটা দিন এই সকল বট গাছের ইতিহাসও শুরু হয়েছে এই রকম একটি সর্ষে দানার মত ক্ষুদ্র বীজের থেকেই। কিন্তু এত এত হাজার লক্ষ বীজ তো প্রতিটা বট গাছের ছায়ায় হেলায় পরে থাকে; তাহলে হাজার হাজার

বট গাছ আমরা দেখতে পাই না কেন? বটের বীজ শুনলেই কেমন যেন একটা " ধংসের" বীজ মনে হয় আমার। কেন এমন ধারণা? পুরোনো বাড়ী, মন্দির বা ধ্বসে পড়ার মত কোন সৌধ লক্ষ্য করে দেখবেন, দেওয়াল ফাটিয়ে মোটা মোটা বট বা অশ্বত্থ গাছের শিকড় উপর থেকে নিচে নেমে, মাটির গভীরে ঢুকে গেছে। এরকম দৃশ্য আপনারা সকলেই দেখেছেন। একবার একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন; ঐ ধংসাত্মক শিকরগুলির শুরু কিভাবে হয়েছে? একটি সামান্য সর্ষে দানার মত একটি বীজ; কোন সুদূর অতীত কালে, ঐ মন্দির বা সৌধের উপর এসে পড়েছিল। আজও সেই কালের নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আজও আমরা প্রায়ই দেখি, বাড়ীর ছাদে, দেওয়ালের গায়ে, জলের নলের পাশে, কবে যেন গজিয়ে উঠেছে একটি ছোট্ট বটের চারা। ছোট্ট চারা অবস্থায়ই একেবারে শিকড় সমেত উপড়ে না ফেললে, কয়েক বছরে ওই ছোট্ট চারা শিকড় নামিয়ে দেবে , তিন চার তলার উপর থেকে একেবারে মাটি পর্যন্ত। তখন তাকে সমূলে উৎপাটন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গিয়ে রস দ্বীপে গেছলাম; সকল যাত্রীই যায় একবার। একসময় ঐ রস দ্বীপেই ছিল আন্দামানের প্রধান শহর। এই তো সেদিন, জাপানের সহায়তায়, নেতাজী ঐ দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ সরকার এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, স্বরাজ দ্বীপ। তার কয়েক বছর পরই ঐ স্বরাজ দ্বীপ বা রস আইল্যান্ড একেবারেই পরিত্যক্ত হয়ে গেল। এখন যাত্রীরা বড় লঞ্চে করে ওখানে যান, ঘন্টা দুই এর জন্য ইতিহাসকে দেখে আসার জন্য। পুরনো দিনের প্রায় প্রতিটা বাড়িই ধংসের মুখে। বট অশ্বত্থের শিকড় এক একটি বাড়ির দেওয়ালকে মাকড়সার জালের মতো আঁকড়ে ধরেছে। তাই ভাবছিলাম, একটা ক্ষুদ্র বীজের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোধহয় এটম বোমার থেকেও বেশি।

কিন্তু এই বীজের যদি এতই প্রাণশক্তি , চার পাঁচ তলা বাড়ির ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত শিকড় নামিয়ে রসদ সংগ্রহ করে ফেলে; তাহলে আমরা সেই বিপুল সংখ্যায় বট গাছ তো দেখি না! এত এত বীজ গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটা বট গাছের আশেপাশে তো অনেক চারা গাছ দেখা যায় না। আমি নিশ্চিত নই, খুব সম্ভবত কোন কোন পাখী ফল খাওয়ার পর, মল ত্যাগ করে ঐ বীজের অঙ্কুরোদগম এ সহায়তা করে। পাখীর শরীরের ভেতরে ঢুকে পরিপাক না হলে, ঐ বীজ থেকে চারা তৈরি হয় না। এই ভাবনার পিছনে একটি প্রাণীর এই রকম একটি ভূমিকার কথা শুনেছি। ভাম বিড়াল বা পাম সিভেট এই রকম একটি বিশেষ গাছের বংশ বিস্তার করতে জরুরী। এই মুহূর্তে ঐ গাছটির নাম মনে পড়ছে না। ঐ গাছের বীজ সরাসরি মাটিতে পুঁতে দেখা গেছে, চারা বেরোচ্ছে না। একমাত্র ভামের মলের থেকে পাওয়া বীজেই চারা গাছ করা যায়।

আচ্ছা, ঐ যে এক জায়গায় কেউ এই ফল খায় কি না , তাই নিয়ে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি, খেয়াল করেছেন? সাধারণভাবে এই বটের ফল মানুষ খায়, এমন খবর আমার জানা ছিল না। কিন্তু একটি অত্যন্ত তথ্য বহুল একটি বই পড়ে জেনেছি, ভগবানজী নামের এক রহস্যময় সাধু প্রচণ্ড দুর্দিনে, বটের ফল সেদ্ধ করে একটু নুন দিয়ে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। সাধু সন্যাসীরা ভিক্ষা করে, গাছের পাতা খেয়ে, দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারেন; আমরা ভারতীয়রা সেটাকে ঐ মহাত্মাদের বিশেষ বা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যদি জানতে পারি, পূর্বাশ্রমে এই মানুষটিই দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন পণ করেছিলেন? যদি এত বছর পরও প্রমাণিত হয় ঐ সাধুর বেশধারী মানুষটিকে আজও আপামর ভারতবাসী দেবতার মত শ্রদ্ধা করে?

তখন কি নিজেকে অপরাধী মনে হয় না ? ঐ বইতে কিন্তু কয়েকশ তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে ; প্রমাণ করা হয়েছে, পরবর্তী কালে কিছুদিন বটের ফল সিদ্ধ করে খেয়ে প্রাণ ধারণ করা মানুষটিই আমার প্রাণের দেবতা। শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। আজও সেই মানুষটির শেষ জীবনের কথা ভাবলে বুক ভার হয়ে যায়, গলার কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে পড়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করে আনে। না; একটি সামান্য বট ফলের কথা বলতে বলতে এমন হৃদয়ে মোচড় দেওয়া স্মৃতি এসে পড়বে, লেখা শুরুর সময় ভাবিনি। ১৭.১১.২৪.

ঘাট

ঘাট বললে আমরা খুব ছোট বেলা থেকেই জানি পুকুরের ঘাট। ঘাট এমন একটা জায়গা ছিল যেখানে বাড়ীর বাসন মাজা থেকে স্নান করতে নামা, কলসী ভরে জল আনা , কাপড় কাচা ধোওয়া এসব প্রাত্যহিক কাজই করা হত। অন্য দিকে নদীর ঘাট বললে বুঝতাম যেখান থেকে নদী পারাপারের জন্য নৌকায় ওঠা যায়। অনেক পরে জেনেছি , ঘাট বললে শ্মশান ঘাটও বোঝায়।

আমাদের গ্রামের বাড়ির পুকুর ঘাটের সাথে আমার ছোট বেলার এত স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে লিখে শেষ করা যাবে না। আমাদের দুটি পুকুর। বড় পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঘাট। আর ছোট পুকুরের দক্ষিণ পুর্ব দিকে। আসলে দুটি ঘাটই পাশা পাশি। ছোট পুকুরটা একেবারেই ডোবা, সারা বছর জল থাকে না। তাই এই ঘাটটা তেমন ব্যবহার করা হয় না। বড় পুকুরের ঘাটই সারা বছর ব্যবহার করা হয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পুকুর ঘাট প্রায় সব একই রকম। বর্ষায় একেবারে টইটম্বুর হয়ে যায়। তখন একেবারে পাড়ের ওপর রাখা পাথরটাতে বসেই জলের নাগাল পাওয়া যায়। এর পর সাধারণ পাথর বা শক্ত গাছের গুঁড়ি ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুকুরের জল যখন একেবারে নিচে নেমে যায় , তখনও একটা কাঠের বা পাথরের ওপর বসে জলে হাত দেওয়া যায়।

এই পুকুর ঘাট গুলি ছিল গ্রামের মহিলাদের কিছুটা সময় কাটানোর বা আড্ডা দেবার জায়গা। আর আমাদের মত বাচ্চাদের ছিপ ফেলে পুঁটি মাছ ধরার জন্য নির্দিষ্ট। তখনকার দিনে পুকুরের পাড়ে পাড়ে নানান ঝোপ ঝাড় গাছপালা থাকত, তাই ঘাটে ছাড়া ছোটদের ছিপ ফেলার সুযোগ হত না। বছর দশেক আগেও আমি গ্রামের বাড়িতে একদিন থাকলেও একবার একটু আটার গুলি নিয়ে মাছ ধরতে চলে যেতাম ঘাটে। আমার ছেলে মেয়ে শহরে জন্মেছে, শহরেই বড় হয়েছে; ওরাও বাড়ী গেলে ছিপ ফেলতে চাইত। এই ঘাটের কাছেই একটা কোন বাঁশের খুঁটি ধরে সাঁতার কাটতে শিখেছি; কোন ছোট বেলায় মনেই নেই। তখন সাঁতার কাটার উৎসাহে ঘাটের কাছের জল ঘোলা করে দিতাম।

একটু বড় হয়েই আমাদের গ্রামের মাঝের পাকা ঘাট হয়ে গেল আমাদের বিকেলে খেলার কেন্দ্র। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠ ছিল একটু বড়দের খেলার মাঠ। আর বাচ্চারা সিমেন্ট বাঁধানো সুন্দর ঘাটের চাথালে, সিমেন্টের বেঞ্চে খেলতাম। কোন দখল করা, কুমীর ডাঙ্গা এই সব ছিল আমাদের খেলা। মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতায় চলে এলাম । সব রকমের খেলা বন্ধ হল। কলকাতা থেকে সোজা বাঁকুড়ায় চলে গেলাম কলেজে পড়তে। এক দেড় বছর পর এক ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বিকেলে পাকা ঘাটে গেলাম। মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছে। আমি ঘাটের ওপরের বেঞ্চে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমাকে দেখে দু একজন ছেলে এসে আমার সাথে কথা বলছিল। মেডিক্যাল কলেজের গল্প ওদের কাছে রূপকথার মতো। একবার মনে হল , অন্য একটি ছেলে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথায় কান রাখছে, কিন্তু কোন কথা বলছে না। কিছু পরে এক দাদা আমাকে রীতিমত জেরা শুরু করল। আমার রাজনৈতিক মতামত কি জানতে চায়। আমার কলেজে কোন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন নেই , মানতেই চায় না। কয়েক মিনিটেই আমাদের কৈশোরের খেলার পাকা ঘাট দুঃস্বপ্নের মরুভূমি হয়ে গেল। আর কোনদিন সেই ঘাটে যাই নি।এই পাকা ঘাট আমাদের প্রজন্মের প্রায় পনের কুড়ি বছরের সব ছেলে মেয়ের কৈশোরের খেলার স্বপ্নের ভেতর থেকে যাবে। শুধু ডাঙ্গায় খেলা নয়, একটু বড় হয়ে ঐ ঘাটের জলে নেমেও কতোদিন খেলেছি। এখন সেই ঘাটটাও অনেক ভেঙ্গে গেছে। বাচ্চারা আর সেই পাকা ঘাটে খেলে না।

পাকা ঘাট , দূরে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার ২০১৫ সালে।

আমাদের গ্রামের বামুন পাড়ায় ভট্টাচর্য্যদের একটা বড় পুকুর আছে। আমাদের স্কুলে যাওয়ার রাস্তার পাশে, কিন্তু ওদের বাড়িটা পুকুরের উল্টো পাড়ে। ঘাটও ওদিকে। তাই ওদের ঘাটটা রাস্তা থেকে দেখতে পেতাম না। একদিন ঐ বাড়ী থেকে গামছায় বেঁধে বলীর পাঁঠার মাংস দিয়েছিল। গামছা ফিরিয়ে দিতে গেলে ওদের বড়মা বললেন, গামছাটা কেচে দিয়ে যা। সেই প্রথম ওদের পুকুর ঘাটে গেলাম। গ্রামের বারোয়ারী পাকা ঘাটের মত না হলেও প্রায় ওরকম বাঁধানো ঘাট। গ্রামে যে আর একটা ওরকম ঘাট আছে, জানতাম না। ওদের পাশের চক্রবর্তি বাড়ী আমাদের কুল পুরোহিত। তাদের বাড়ীর ঘাট বাড়ীর পিছন দিকে, বাড়ীর ভেতর দিয়ে রাস্তা। তাই ঘাটে কোনদিন যাইনি। আমরা গল্প শুনতাম যে ঐ চক্রবর্তি বাড়ীর পুকুরে পোষ মানানো ঘেটো রুই মাছ আছে। ঠাকুর মশাই নিজের হাতে ওদের খাইয়ে দেন। এমনকি পোষা মাছের নাকে সোনার নথও আছে। ছোট বেলার গল্প তো গল্পই , কে আর মিলিয়ে দেখতে যাচ্ছে! আমার বাড়ীর একুয়ারিয়ামে দুটি কৈ মাছ আছে। ওরা লাফিয়ে উঠে আমার হাত থেকে ভাত খায়।

আমাদের গ্রামের বাড়ির থেকে শহরের দিকে আসতে হলে লোয়াদায় নদীর ঘাট পেরোতে হয়। বছরের মধ্যে সাড়ে দশ মাস নদী শুকনো থাকে, গাড়ী নিয়ে চলে যাওয়া যায়। বর্ষার দু' মাস নৌকায় পেরোতে হয়। কলকাতায় এসে জানলাম, গঙ্গা নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক ঘাট। এই ঘাট দুই রকম। লঞ্চে পারাপারের জন্য ফেরি ঘাট। আর নিমতলার মত শ্মশান ঘাট। ফেরি ঘাট কয়েকটিতেই গিয়েছি, পারাপার করেছি ; কিন্তু শ্মশান ঘাটে একবারই যেতে হয়েছে এখন পর্যন্ত। নিমতার সোনা কাকিমা মারা যাওয়ার পর গেছলাম , রতন বাবুর ঘাটে।

ঘাটের কথা বলতে হলে কাশী অর্থাৎ বেনারসের ঘাটের কথা বলতেই হয়। বিশ্বনাথের মন্দির ছাড়া বেনারসের বাকী সব শুধু ঘাট আর ঘাট। ওরা বলে ওখানে চৌষট্টি ঘাট আছে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট জগৎ বিখ্যাত। বাংলা সাহিত্যে সিনেমায় এই কাশী আর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা বহুবার পাওয়া যায়। এই ঘাটগুলি কিন্তু মূলত স্নানের ঘাট। মনিকর্নিকা আর হরিশচন্দ্র ঘাটে সব সময়ই চিতা জ্বলছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের যা পৌরাণিক আর সাহিত্যে প্রচার সে তুলনায় বাকী সব ঘাট শত হস্ত পিছিয়ে আছে। এই দশাশ্বমেধ বা তার আসে পাশের ঘাটে সব সময়ই কিছু লোক স্নান করছে। বাঁধানো ঘাটের এদিক ওদিক অনেক পান্ডা পুরোহিত বসে গেছেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটা মেলা মেলা পরিবেশ। ঘাটের ওপরে , পান্ডার পাশেই নাঙ্গা সাধু গায়ে ছাই ভস্ম মেখে বসে আছে। জপ তপ কখন করে জানিনা, সবার কাছেই হাত পেতে পয়সা চাইছে। আমরা ভোর রাতে গিয়েও দেখেছি, পুণ্যার্থী র ভিড়। কেউ স্নান সেরে পূজা করছে। কেউ শাল পাতার ছোট্ট ঠোঙায় ফুল আর প্রদীপ জলে ভাসাচ্ছে। বিদেশী ট্যুরিস্টরা এসব রঙ্গ দেখে পটাপট ছবি তুলছে। বিকেলে দাঁড় টানা নৌকা ভাড়া নিয়ে আধ মাইল মত গঙ্গা নদীর ওপর ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যায় ওখানের আরতী নাকি জগৎ বিখ্যাত । ঘাটে কয়েকশ নৌকায় হাজার খানেক লোক বসে গঙ্গা আরতি দেখা হল। এখন আবার দু দলে ভাগাভাগি করে দু পাশে আরতি করে। প্রচুর ঘন্টা ধ্বনি আর মাইকে মন্ত্র পাঠ এসব মিলে একটা জমজমাট

ব্যাপার। এর থেকে অনেক সুন্দর দেখতে ঋষিকেশ এর ত্রিবেণী ঘাটের আরতি। আমি হরিদ্বার এর হর কি পৌড়ি ঘাটেও গঙ্গা আরতি দেখেছি। সবই যেন আড়ম্বর প্রদর্শন।

দশাশ্বমেহ ঘাট

রীষিকেশী ত্রিবেনী ঘাট

প্রায় সব জেলাতেই বেশ কয়েকটা করে বিখ্যাত ঘাট আছে। এক সময় নদীর নৌকা পারাপারের ঘাট ছিল হয়তো, কিন্তু এখন অনেক জায়গাই আর নৌকা চলে না।অনেক জায়গায় নদীর ওপর পাকা সেতু হয়ে গেছে, বাস চলাচল করে। আমি কয়েকটা অদ্ভুত নামের ঘাটে পারাপার করেছি। সব থেকে অদ্ভুত নাম, আট নম্বর লটের ঘাট। কাকদ্বীপ বা নামখানা থেকে গঙ্গা সাগর দ্বীপে যাওযার জন্য এই ঘাটে বিশাল বিশাল ভেসেল চলে। উত্তর দিনাজপুরের পাল্লোলিয়া ঘাট, মহানন্দা পেরিয়ে ওপারে মালদা জেলা। বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে মনিহারির ঘাট আর গোয়ালন্দের ঘাট। ফারাক্কার ব্যারাজ হয়ে গিয়ে মনিহারীর ঘাট ইতিহাসে চলে গেছে। কবি গুরুর লেখনী গোয়ালন্দ ঘাটকে অমর করেছে,; কিন্তু সে ঘাট আজ বিদেশে। মেদিনীপুরের গান্ধীঘাট আর বাঁকুড়ার সতীঘাট বিখ্যাত। মায়াপুরের হুলোরঘাটও এখন

বিখ্যাত। ব্যারাকপুর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত গঙ্গার উপর অনেক ঘাট। ধোবি ঘাট, দু'পয়সার ঘাট। নিমাইতীর্থ ঘাটের জল নিয়ে তারকেশ্বর যাত্রা শুরু হয়।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট কিন্তু একেবারেই অন্য কারণে বিখ্যাত। এটা কোন নদী পারাপারের ঘাট নয়। বলা যায় একটা সুন্দর করে বাঁধানো স্নানের ঘাট। তবে এই ঘাট বিখ্যাত মহাত্মা গান্ধীর একটি স্মৃতি স্তম্ভের জন্য। গান্ধী জয়ন্তীর দিন এখানে মাননীয় রাজ্যপাল আসেন। সুত্র যজ্ঞ , সর্ব ধর্মের প্রার্থনা হয়। এটি দেশের মধ্যে প্রথম মহাত্মার স্মৃতি মন্দির। হিন্দু, মুসলিম আর খ্রীষ্টান তিন ধর্মের চিনহ আছে এই স্তম্ভে।

এদেশের নদী আর তার ঘাট গুলির সাথে নানা রকম পৌরাণিক আর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে। শৈলেন্দ্র নারায়ন ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই তাঁর তপোভূমি নর্মদা গ্রন্থে এমন অনেক কিছুই লিখেছেন । ওংকারেশ্বরের অহল্যাবাই ঘাটে বসে, শাস্ত্রী মশাই প্রলয় দাসজীর কথা শুনছেন; এই দৃশ্য যেন চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। শাস্ত্রী মশাই পুর্ব পুরুষের তর্পণ না করাকে পাপীর কাজ বলেছেন। আমি ওনাদের বলা গভীর আধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা বলতে পারব না। হিন্দু ধর্মের অনেক ক্রিয়াকান্ড মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদের কুফল, এ বলার অপেক্ষা রাখেনা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তর্পণ এর জন্য যে লাখ লাখ লোক জমায়েত হয়, তার একটা মহান তাৎপর্য আমার কাছে প্রকাশ পায়। অন্য সকল বৈদিক ক্রিয়াকান্ড লোকে করে পুণ্যের লোভে। তর্পণ কেন করে? শুধুই আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর এই যে অনুষ্ঠান , একে অবজ্ঞা করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

মহেশ্বরের নর্মদা ঘাটে(২০.১২.২৪)

সাপুড়ে

বাপুরাম সাপুড়েকে জানার আগেই আমরা গ্রামে সাপুড়ে দেখেছি। সাপুড়েরা গোল গোল ঝাঁপিতে ভরে সাপ নিয়ে আসত, গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপের খেলা দেখিয়ে চাল –পয়সা সংগ্রহ করত। যদিও এরাও এক রকম ভিখারীই ছিল, এদের আমরা ভিখারীদের থেকে একটু আলাদা ভাবতাম। এই সাপুড়ে বা বাঁদর নাচ দেখানো লোকগুলি ভিখারীর মতন বাড়ী বাড়ী ঘুরত ঠিকই, তবুও এদের , বিশেষ করে সাপুড়েদের আলাদা একটা মর্যাদা ছিল। অবশ্য আমাদের গ্রামের ওদিকে যে সব সাপুড়ে আসত তাদের আমরা কখনো ওঝাগিরী করতে শুনিনি। ওদের আমরা গুনিনও বলতাম। একটা ধারণা ছিল যে ওদের কিছু মন্ত্র বা তুকতাক জানা আছে, যা দিয়ে ওরা সাপকে বশ মানায়।

আমাদের পাশের গ্রামে বছরে একদিন ঝাঁপান মেলা বসত। নির্দিষ্ট তিথি কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই, আজ আর মনে নেই। একবার কি দুবার ঐ মেলায় সাপুড়েদের সাপ খেলা দেখতে গিয়েছি। কুড়ি তিরিশ জন সাপুড়ে এসে হাজির হত। তাদের মধ্যে পাশের গ্রামের যুগলদাকেও খেলা দেখাতে দেখেছি। ওদের সাপের খেলা আমাদের কাছে নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু যুগলদা কিছু কিছু ছড়া কেটে মন্ত্র জাতীয় কিছু বলছিল, আজও তা মনে আছে। " কোন গুরুর নাম জানি, কোন গুরুর নাম নাহি জানি, সকল গুরু তুলে নিলাম মাথে; কাল সাপ দিলেন গুরু হাতে"। বহু বছর পর ক্যানিং যুক্তিবাদী সমিতির অনুষ্ঠানে গিয়ে , হারানবাবুর কাছে এরকম লম্বা লম্বা ছড়া শুনেছি। সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র বলে ঐ সব ছড়া বলা হত। কিন্তু ওতে যে কোন কাজ হয় না, চল্লিশ বছর ওঝাগিরি করে হারানবাবু সেটা বুঝেছেন।

এই যুগলদা কিন্তু কোনদিন সাপের ঝাঁপি নিয়ে খেলা দেখাতে আসেনি। লোকের বাড়িতে ক্ষেত মজুরের কাজ করতে দেখেছি যুগলদাকে। আমি গ্রাম ছেড়ে চলে আসার অনেক পরে যুগলদা সাপের কামড় খেয়েই মারা গেছেন। আমাদের ঐ ছোট বেলায় ধারণা ছিল, সাপুড়েরা মন্ত্র বলে সাপেদের বশ করে। নিদেন পক্ষে ওদের কাছে কোন জড়িবুটি, শেকড় বাকর থাকে, যায় জন্য সাপ ওদের কামড়ায় না। এসব যে একেবারেই বাজে কথা তার প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি।

সিনেমায় সাপুড়েদের বীণ বাজিয়ে সাপ খেলাতে দেখা যায়; কিন্তু আমি কোনদিন কোন সাপুড়েকে বিণ বা বাঁশী বাজাতে দেখনি। অনেকের ধারণা, সাপ ঐ বিনের শব্দে আকৃষ্ট হয়। এটাও একেবারেই ভুল ধারণা। সাপের কানই নেই, ওরা শব্দ শুনতে পায় না। সাপ বা সাপুড়ে নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণার এটাও একটা। বছর তিনেক আগে আমার সিনিয়ার এক ডাক্তারবাবু আমাকে ফোন করে বললেন, আমাদের একটা দোকানে সাপ ঢুকতে দেখা গেছে, কোন সাপুড়ের সন্ধান দিতে পারেন? বীণ বাজিয়ে সাপকে বের করে আনবে! সাপ ধরাটা যে একেবারেই একটা হাতের কৌশল আর সাহসের ব্যাপার, এটা শুধু আজকাল আমরা বলছি তা নয়; বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্ততে সে কথা লিখে গেছেন, প্রায় একশ বছর আগে। তবুও মানুষের মধ্যে এই ধারণা আজও বদ্ধ মূল।

সাপ ধরা আর সাপের খেলা দেখানো এক দল লোকের জীবিকা ছিল। দেশের আইনে এসব কাজ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য এদের পেশা পাল্টাতে হয়েছে। তবুও এখনও অনেক জায়গায়ই সাপুড়েদের দেখা যায়।

এরা রোজগারের পথ বা কায়দা পাল্টেছে। আগেও এরা ওদের এই সাপ ধরার হাতের কায়দাকে কিছুটা অলৌকিক ক্ষমতা বলে দেখিয়ে তাবিজ- কবচ , জড়ি -বুটি বিক্রী করত। এসব জিনিসে বিশ্বাস করার লোকের অভাব এখনও নেই। হাবড়া রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এরকম সাপুড়েদের দুটি গুমটি দোকান আছে। ওরা প্রথমে সাপের খেলা দেখিয়ে লোক জমা করে; তারপর ঐ সব জড়ি- বুটি বিক্রী করে। এঁদের একজনকে একবার কেউটে সাপে কামড় দেয়, সাপ ধরতে গিয়ে। আমি তখন হাবড়া হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ডিউটি করছিলাম। লোকটি ঝিমিয়ে পড়েছে দেখে সাথে সাথেই ভর্তি করে অ্যান্টি ভেনম চালাই। ওর সাথে যে বয়স্ক লোকটি এসেছিল, সে আমাকে বলছিল, এরা কিন্তু সাপুড়ে নয়, বিজ্ঞান কর্মী। এই যে সাপে কামড়ালে হাসপাতালেই চিকিৎসা করতে হবে, এই ব্যাপারটা যে ওরা বুঝেছে, এটাই বিজ্ঞান মানসিকতা।

এই সাপুড়েদের খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে তামিনাড়ুতে মহাবলীপুরম ইরুলা কোপারেটিভ সোসাইটি তৈরী করা হয়েছে চল্লিশ বছরের বেশী হল। এখন সরকারী ভাবে এই একটি জায়গায়ই সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়। (পরে মহারাষ্ট্রের জন্য মুম্বইতে , আর গুজরাটের জন্যও আলাদা বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র হয়েছে)। এই সাপের বিষ থেকেই দেশের সবকটি ল্যাবরেটরিতে সাপের বিষের অ্যান্টি ভেনম তৈরি হয়। এই ইরুলা বা সাপুড়েরাই আজ গোটা দেশের মানুষের জন্য সাপের বিষ সহগ্রহের কাজটি করে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে এদের মত বংশ পরম্পরায় সাপুড়ে এখনও অনেক আছে। এদের ঠিক মত কাজ দেওয়া হয় না, এরা অন্য কাজও তেমন পারে না। বাধ্য হয়েই বেআইনি কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই বলছেন, ভারতে চার প্রান্তে চারটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র থাকা উচিত। বর্ধমান জেলার পাল্লা রোডে সাপুড়েদের একটি বড় পাড়া আছে। এই মালপাড়ার সাপুড়েদের কাজে লাগিয়ে এরাজ্যেও ইরুলা সোসাইটির মত বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র করা যায়। এতে এ রাজ্যের সাপে কাটা রুগীদের জন্য উন্নত অ্যান্টি ভেনম তৈরি করা যাবে। (২০২২ সালে এ রাজ্যেও একটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র হয়েছে, বেসরকারী উদ্দোগে। কিন্তু সেই বিষ থেকে ২০২৪ সালের শেষেও অ্যান্টি ভেনম তৈরি হচ্ছে, এমন খবর আমাদের জানা নেই।

সাপুড়েদের সমন্ধে আমার নিজের ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছেন ক্যানিং যুক্তিবাদির তিন সৈনিক। হারান প্রামাণিক, দ্বিজপদ হাজারী আর কাবিল জমাদার। এরা তিনজনই এক সময় পেশাগত ভাবেই সাপুড়ে ছিলেন। হারাণবাবু চল্লিশ বছর সাপুড়ে আর ওঝাগিরি করার পর, যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হয়ে যান। এখন ওনারা সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বোঝান যে, মন্ত্র তন্ত্র বা জরিবুটিতে কোন কাজ হয় না। সাপে কাটার একমাত্র ওষুধ অ্যান্টি ভেনম। কাবিল জমাদার ভাই গত কয়েক বছর ধরেই সাপে কাটা রুগীদের নিজের মোটর বাইকে চাপিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে। সাপুড়েদের বিশেষ ক্ষমতাকে এরকম নানান কাজে লাগানো যায়। আমরা এসব নিয়ে ভাবছি কি?

পুনশ্চ: পুরনো লেখাগুলি আবার এক জায়গায় এনে , E -Book করার কাজ শুরু করেছি, ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। এর মধ্যে অনেক নতুন নতুন খবর এসে গিয়েছে। সেগুলিই , পুনশ্চ বলে আবার যোগ করছি।

মেদিনীপুরের বালিচক স্টেশনের কাছে, দীপক সর্দার নামে পরিচিত একজন বেশ বিখ্যাত সাপুড়ে ছিলেন। আমার সাথে ওনার যখন আলাপ হয় তখন আর উনি ' সাপের খেলা ' দেখান না। উনি একটি স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে,সেখানে সর্প প্রদর্শনী করেছিলেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, নিজের কাছে রাখা সাপের কামড় খেয়েই ওনার প্রাণ যায়। তখন ওনার বয়স আশির আশেপাশে। আমার প্রিয় ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার শুভেন্দু শেষ জীবনে ওনার প্রাণ ধারণ এর অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। শুভেন্দু ওনার শেষ কয়েক বছর এর করুন কাহিনী আমাকে জানিয়েছে। সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওনার ঐ সাপ ধরার বিশেষ ক্ষমতাকে কোন গঠনমূলক কাজে লাগাতে না পারার জন্য ওনার শেষ জীবন দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থায় কেটেছে।

সাপের ছোবলে মৃত্যু সর্পবন্ধুর

এই সময়, মেদিনীপুর: আজীবন সাপ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন তিনি। প্রচার করেছেন সাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বুজরুকি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তবে বেআইনি হলেও নিজের বাড়িতে সাপ পুষতেন। নিয়মিত খাওয়াতেন পোষা সাপেদের। রোজের কাজটা করতে গিয়েই কোবরার ছোবল খান মঙ্গলবার দুপুরে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মৃত্যু হয় দীপক সর্দার (৭৫) নামে ওই সর্প বিশারদের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বালিচকে।

আদতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর এলাকার বাসিন্দা হলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বালিচকে থাকতেন দীপক সর্দার। পেশায় সাপুড়ে ছিলেন। তবে 'সাপের খেলা' নয়, প্রদর্শনী করে মানুষকে বোঝাতেন জীববৈচিত্র রক্ষা করতে কেন সাপের প্রয়োজন, কেন সাপ মারা উচিত নয়, কোন সাপের কী

প্রয়াত দীপক সর্দার

উপকার ইত্যাদি। এক সময়ে বাড়িতে ৬৫টি সাপ ছিল তাঁর। এই মুহূর্তে ১২টি সাপ রয়ে গিয়েছে। সাপের ছোবল খাওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে ভোররাতে মারা যান তিনি। ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার মৃতদেহ ডেবরা থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেদিনীপুরে এ দিন ময়নাতদন্ত হয়।

সন্ধ্যায় বিজ্ঞানমনস্ক সর্পবন্ধু দীপক সর্দারকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে। মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক বাবুলাল শামসল বলেন, 'বুজরুকির আশ্রয় নেননি কোনও দিন। বরং সাপ সম্পর্কে সবাইকে বোঝাতেন। বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে তিনশোটির বেশি সচেতনতা শিবির করেছেন। ৬৫টা সাপ নিয়ে খাঁচার মধ্যে থেকেছেন। প্রদর্শনী করেছেন মানুষকে সচেতন করতে। এর আগে ওঁকে সাত বার সাপে ছোবল মেরেছে। এটা অষ্টম বার। এ বার আর নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। তবে সাপ পোষা তো বেআইনি। আশা করি, বন দপ্তর সাপগুলি উদ্ধার করবে।'

ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, 'অন্যান্য সাপুড়েদের থেকে দীপক সর্দার সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। জীবনে অনেক সচেতনতা শিবির করেছেন। এর আগে একাধিক বার সাপের ছোবল খেয়েছেন। হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। এ বার আর ফিরলেন না।'

তবে বাড়িতে যেহেতু সাপ পোষা বেআইনি, তাই সে প্রসঙ্গও এ দিন বার বার উঠেছে। গড়াপুরের ডিএফও মণীশ যাদব বলেন, 'বালিচকে ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৬টি সাপ উদ্ধার হয়েছে। আমরা সাপগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। উনি কেন বাড়িতে সাপ রাখতেন, কী করতেন ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করে দেখা হবে।'

সুধা সাগরের তীরে

জানিনা কোন সুকৃতির জন্য, মহাভারতের সুধা সাগরের তীরে এসে পৌঁছেছিলাম একদিন। মূল মহাভারত পড়ার মত সংস্কৃত ভাষার দখল আমার নেই। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মহাভারত ভাষ্যকার ,আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই-এর লেখাগুলি পড়তে শুরু করেছি বছর পনের হল। ভাদুড়ী মশাই -এর "কথা অমৃত সমান" না পড়লে মহাভারতের সুধা সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের প্রাণারাম প্রবাহ থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতাম। আর এক যোগাযোগ হল করোনা অতিমারীর সময়। বেলুড়ের মহারাজ সমর্পনানন্দের ইউটিউব কথকতাগুলি শুনতে শুরু করলাম এই সময়।

মহাভারতের সাধারণ গল্প প্রায় সবারই জানা আছে। কিন্তু ঐ বড় বড় ঘটনার মধ্যে মধ্যেই অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনী আছে, যেগুলি আচার্যদের কাছে না শুনলে কিছুই বুঝতাম না। মহাভারতে বড় বড় চরিত্র অনেক আছেন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, মহামতি বিদুর, ভীম, অর্জুন, কুন্তী, দ্রৌপদী, এদের কথা সবাই জানেন। এমনকি আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লেখা , মণিপুরনৃপদুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এইসব বিখ্যাত সব নায়ক নায়িকা ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট চরিত্র আছেন গোটা মহাকাব্য জুড়েই। বড় বড় চরিত্ররা আমাদের সামনে বড় বড় আদর্শ খাড়া করেছেন। আমরা নগন্য আমজনতা তাঁদের দূর থেকে দেখতেই অভ্যাস করেছি। মহাকাব্যের মধ্যের ছোট ছোট চরিত্রগুলি আমাদের অনেক কাছের মনে হয়। মহাভারতে মহিলাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল, কুন্তীর সাথে দ্রৌপদীর বা দ্রৌপদী থাকা সত্বেও অর্জুনের আরও কয়েকটি বিবাহ , দ্রৌপদীর সাথে সুভদ্রার সম্পর্ক এসব বেশ প্রচারিত। আজ আমি মহাভারতের দুজন প্রায় অজানা মহিলার কথা বলতে চাইছি।

এনারা দুজন হলেন, মন্দপাল ঋষীর দুই সহধর্মিনী , জরীতা আর লপিটা। এই কাহিনীতে একটি অলৌকিকতা আছে। ভাদুড়ী মশাই বলবেন, এইসবের মধ্যে একটা " মহাকাব্যিক অভিসন্ধি" আছে। মহাকাব্য বুঝতে হলে, এই মহাকাব্যিক অভিসন্ধি মাথায় রাখতে হবে।

এনাদের প্রসঙ্গ এসেছে , বিখ্যাত খান্ডব বন দহনের সময়। দাবানলে পুড়ে যাচ্ছে গোটা একটা বন। পরে এখানেই তৈরী হবে পান্ডবদের বিশাল মায়া প্রাসাদ। বনের সব পশু পাখী আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে। একটি গাছে পক্ষী মাতা জরীতা তাঁর চার শিশুকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। বাচ্চাদের তখনও পালক গজানোর সময় হয়নি। মা জরীতা ওদের চার জনকে নিয়ে উড়ে যেতেও পারবেন না। আগুন ধেয়ে আসছে। মা আর চার শিশু নিজেদেরকে কি করে বাঁচাবেন তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। এই পাঁচ জনই যতেষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী। আসলে মন্দপাল ঋষি বিশেষ কারণে পক্ষী অবতার নিয়ে এসে বিদুষী জরিতাকে বিয়ে করে , চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই বাচ্চারাও সব একেকজন তত্ত্বজ্ঞানী। মাঝখান থেকে দাবানল এসে সব গণ্ডগোল করে দিয়েছে। মন্দপাল ঋষি যোগবলে দাবানলের খবর পেয়ে , অগ্নি দেবতাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁর চার শিশুকে না মারতে। চার সন্তানের ধর্ম যুক্তি মেনে নিয়ে, মা জরীতা সময় মত উড়ে গিয়ে দাবানল থেকে বেঁচেছেন। বাচ্চাদের কাছে পৌঁছনোর পর , তাদের মুখে ধর্মের গভীর তত্ব শুনেই অগ্নি দেবতা ওদের চিনতে পারেন। সব ঝামেলা মিটে যেতেই মা জরীতা বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসেন।

ওদিকে মনুষ্য শরীরে ঋষি মন্দপাল তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে উৎকন্ঠায় থাকতে না পেরে, আবার পক্ষী রূপ নিয়ে বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইলেন। এবার মানবী স্ত্রী লপিটা রেগে গেলেন। তার মনে হচ্ছে, এই ঋষি আসলে , বাচ্চাদের দেখার ছলে, জরিতার কাছে যেতে চাইছেন। ঋষি আর ঋষি পত্নী হলেও , স্বামী অন্য সতীনের কাছে যাবেন এটা লপিটা মানতে পারছেন না। ঋষির ইচ্ছা শুনেই তাঁকে গঞ্জনা দিতে শুরু করেছেন। আমরা অধম কলির জীব, কি বুঝলাম? তপস্বীনি হোক আর ঋষি পত্নীই হোক , সতীনের সাথে সতীনের সম্পর্ক সব যুগেই সমান।

প্রধান শিক্ষক

বেলঘরিয়ার ছাত্র মঙ্গল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসের ধাক্কায় মারা যান। ওনার মুখ থেকে শেষ কথাটি ছিল, " ছাত্র মঙ্গল"। প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে এ কথা শুনেছিলাম। ছাত্র মঙ্গল স্কুলের সেই প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মশাই এর নাম আমার শাশুড়ি মা সেদিন বলেছিলেন কি না , আজ আর আমার মনে নেই। প্রধান শিক্ষক মশাই এর নামটা আমি লিখতে পারলাম না। তার আগে পরে অসংখ্যবার বেলঘরিয়ায় গেলেও, ছাত্র মঙ্গল স্কুলটি আমি দেখনি। কিন্তু সেই ছাত্র দরদী, স্কুল অন্ত প্রাণ , হেড মাষ্টারের কথা আমি ভুলতে পারিনি।

আমার নিজের সরাসরি শিক্ষক, দু'জন প্রধান শিক্ষক মশাইকে সামনে থেকে দেখেছি। আমার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রয়াত নীলরতন মণ্ডল মশাই সম্বন্ধে আগেও লিখেছি। কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবেই। বিশেষ করে আমাদের দেশের যা কর্ম সংস্কৃতি, এখানে কাজ করাটাই প্রায় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আমার গ্রামের একটা ছন্নছাড়া হাইস্কুলের যে উন্নতি আমার প্রণম্য হেড স্যার করে দেখিয়েছেন, তা নিয়ে লিখলেই একটা বই হয়ে যাবে। অনেক পরে হিসেব করে দেখেছি, মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে উনি আমাদের কুসুম কুমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। আমি তখন ক্লাশ সিক্সে পড়ি। ঐ বয়সে কি অদ্ভুত এক গাম্ভীর্য ছিল হেড স্যারের চলনে বলনে। ডিসিপ্লিন কথাটাকে আমরা যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি। শিক্ষক কেমন করে জাতি গঠন করেন , ওনাকে না দেখলে কোনদিন জানা হত না । বছর তিরিশ ধরে , আমাদের আসে পাশের পাঁচ- সাতটা গ্রামের কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রীর জীবনের মূল্যবোধ তৈরী করেছেন, হেড স্যার। যে কোন শিক্ষিত মানুষ এর মতই ওনার নিজের রাজনৈতিক পছন্দ ছিল। আমরা যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এ রাজ্যে একটিই রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের সাথে গান্ধীজীর আদর্শ ছিল। শিক্ষিত লোকেরা হয় ঐ দল করতেন, নয়তো কিছুই করতেন না। আমাদের হেড স্যার ছিলেন অসম্ভব ভালো বাগ্মী। আমরা স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনার বক্তৃতা, মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনতাম। ওনার এই ব্যতিক্রমী ক্ষমতাকে রাজনৈতিক দলের লোকেরা কাজে লাগাতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। এই রাজনৈতিক দলের মিটিং -এ বক্তৃতা দিতে যাওয়া ওনার একটা দুর্বলতা ছিল। ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে বেনো জলের মত রাজনীতির বন্যা এল। মানীর মান, শিক্ষকের মূল্যবোধ, ছাত্রের বিনয়, পারলে মাতৃস্নেহকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঐ রকম হেড স্যারও নিজের চার বার ফেল করা ছাত্রের হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। তবুও চাকরীর নিয়ম মেনে ঐ স্কুল থেকেই হেড স্যার অবসর নিয়েছিলেন।

নীলরতনবাবু

আমার দ্বিতীয় স্কুল, কলকাতার এক সময়ের নামী স্কুল। আমি গ্রামের স্কুল থেকে নতুন মাধ্যমিক পাশ করে , এগারো ক্লাশে পড়ার জন্য এসে ভর্তি হলাম। জীবনে সেই প্রথম শুনলাম, রেক্টার বলে একটি পদ হয়। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, পূজ্যপাদ জ্যোতির্বিকাশ মিত্র মহাশয় অবসর নেওয়ার পর , রেক্টার পদেই রেখে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন এখানে আসি তার বোধ হয় বছর কুড়ি আগে উনি অবসর নিয়েছেন। অকৃতদার বৃদ্ধ মানুষটি স্কুলেরই একটি ঘরে থাকতেন। আমাদের এগারো ক্লাশে আমরা চার- পাঁচ জন বাইরে থেকে এসেছিলাম; বাকী সবই ঐ

স্কুলেই পড়েছে। সবাই প্রায় প্রাথমিক স্তর থেকেই। ওদের দেখতাম, রেক্টার দাদুকে দেবতার মত ভক্তি করতে। রেক্টার আমাদের ইংরেজী পড়াতেন।এখানেও সেই রাজনীতির বেনো জলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। মাস ছয়েকও বোধ হয় ঠিক মত ক্লাশ হয়নি; স্কুলে কি একটা গন্ডগোল শুরু হল। আমাদের এগারো বারো ক্লাশের ব্যবস্থা মূল ভবনের পিছনের একটা ছোট বাড়ীতে। আমাদের ক্লাশ শুরু হত এক ঘন্টা আগে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকেরা আংশিক সময়ের জন্য আমাদের স্কুলে এসে পড়িয়ে যেতেন। তাঁদের অনেকেই ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র , কিংবা শুধুই রেক্টারের অনুরোধে আমাদের পড়াতে আসতেন।

গণ্ডগোল শুরুর প্রথম দিকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাশ শুরুর পর, বড় বাড়ীর দিক থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ শুনতে পেতাম। আমাদের দ্বিতীয় ক্লাশটা শেষ হলেই , আমাদের সহপাঠি, ঐ স্কুলের পুরনো ছাত্ররা বড় বাড়ীর দিকে দৌড়ে যেত। আমরা যারা বাইরে থেকে এসে ওখানে ভর্তি হয়েছি, তারা ওদের পিছন পিছন যেতাম, ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য। প্রথম দিকে দেখতাম, শিক্ষকদের বসার ঘরে শিক্ষকরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। ক্রমশ বুঝলাম, ওনারা দুই দলে ভাগ হয়ে প্রায় হাতাহাতি করছেন। আমাদের সহপাঠীরাও সেই ঝগড়াঝাটির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কয়েকজন টিচারস রুমের বাইরে থেকে ," রেক্টার জিন্দাবাদ" বলে শ্লোগান দিত। মাঝে মাঝে তৃতীয় পিরিয়ডে কোন অধ্যাপকের ক্লাশ শুরু হলে আমরা ফিরে এসে আমাদের ক্লাশে বসে যেতাম। কোন কোন দিন দেখেছি , অন্য স্কুল বা কলেজের মস্তান মত ছেলেরা এসে আমাদের স্কুলের বড় গেটের বাইরে থেকে শ্লোগান দিচ্ছে, বা লোহার রড দিয়ে স্কুলের বন্ধ কলাপসিবল গেটের উপর বাড়ী মারছে। আমরা যারা গ্রামের থেকে এসেছিলাম, ভয় পেয়ে পিছনের বাড়ীর ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে , পিছনের গলি দিয়ে সরে পড়তাম। স্কুলের পড়াশোনা লাটে উঠল। ঐ স্কুলের পুরনো ছেলেদের কাছে গন্ডগোলের কারণ একটু একটু করে জেনেছিলাম। শাসক দলের অনুগত শিক্ষকদের সাথে রেক্টারের সমর্থক শিক্ষকদের গন্ডগোল। শাসক দলের অনুগত এক শিক্ষক আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। মূলত উনিই রেক্টারকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে নিজে হেড মাষ্টার হওয়ার জন্য ঘোট পাকিয়ে ছিলেন।

আমি বারো ক্লাসের পরীক্ষার পর হয়তো এক কি দু'বার রেজাল্ট নিতে স্কুলে গিয়েছিলাম। তখনো রেক্টার স্কুলে ছিলেন জানতাম। অনেক পরে শুনেছি, সেই ইংরেজীর শিক্ষকই প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। আমরা স্কুল ছাড়ার বছর দশেক পর খবরের কাগজে রেক্টারের মৃত্যু সংবাদ দেখেছিলাম।

আমার নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক দু'জনকেই রাজনৈতিক পালা বদলের শিকার হতে দেখেছি। এই পালা বদলের ফলে শিক্ষকদের যেমন খোলাখুলিই রাজনীতি করতে দেখেছি, তেমনি স্কুলশিক্ষক আর স্কুলগুলোর বাড়ী ঘরের প্রভূত উন্নতি দেখেছি। শিক্ষকদের উন্নতি বলতে আমি তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলছি। আমার দুই প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নৈতিক উন্নয়নের দিকে যেভাবে নজর দিতেন, আজকাল আর কেউ তেমন করেন কি না আমার জানা নেই। আমাদের প্রজন্মের ছাত্ররা সবাই এখন অভিভাবক হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমাদের পরের প্রজন্মেরও অনেকের ছেলে মেয়ে এখন হাইস্কুলে পড়ছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই এখন রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুল।

পেশা জীবনে ঢুকে যাওয়ায় পর অনেক স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, পেশার কারণেই। সামান্য সময়ের জন্য গেলেও বুঝতে পারি , চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে ছাত্র শিক্ষক যে সম্পর্ক দেখেছি, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।এই দুঃসময়ে দাঁড়িয়েও আমার পরিচিত একজন অন্তত প্রধান শিক্ষক পুরনো মূল্যবোধ ধরে রাখার চেষ্টা করছেন দেখেছি।

মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল, গোমকপোতা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। সেখানকার প্রধান শিক্ষক, সুব্রত কুমার বুড়াই মশাই -এর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে বছর দশেক আগে। আমার ভ্রাতৃ প্রতিম এই বুড়াইবাবু স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি নানান সামাজিক কাজে ব্যস্ত আছেন। আমাকে ওনার গ্রামে সাপের কামড় নিয়ে বলার জন্য নিয়ে যান, বছর দশেক আগে প্রথমবার। তারপর থেকে অনেকবারই ওদিকে গিয়েছি ওনার ডাকে। এলাকার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরী করতে নানান রকম অনুষ্ঠান ওনারা করে চলেছেন, গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। বুড়াইবাবুর অনেক প্রাক্তন ছাত্র এখন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে দেশে

বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেক দুস্থ ছাত্রকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা করে, পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করে চলেছেন। শুধু আমাদের সাপের কামড়ের সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই এই প্রধান শিক্ষক যে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে ওনাকে অন্তত পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়াই যায়। অবসরের বছর চারেক আগে উনি শিক্ষারত্ন হরেছেন।আর একটা ব্যাপার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই রাজনীতির সুনামীর মধ্যে থেকেও এই প্রধান শিক্ষক মশাই নিজেকে রাজনীতির কলুষ মুক্ত রাখতে পেরেছেন, এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব। আমার প্রিয় বুড়াই বাবুকে আরও অনেক দিন শিক্ষকতা করতে হবে; উনি সসম্মানে বাকী বছরগুলিতেও এভাবেই কাজ করতে পারবেন, এই কামনা করি।

সাপের কামড়ে মৃত দুই ছাত্র-ছাত্রীর সাথে বুড়াইবাবু

পুনশ্চ: এই কদিন আগে, ৩০ শে নভেম্বর, এই বুড়াই বাবু শিক্ষকতার চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। করোনা অতিমারীর সময়ই বুড়াইবাবু নিয়মিত অন লাইন ক্লাস নিয়েছেন, ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে বসেও।

নিতাই দাদা ১

আমার আপাতত চারজন নিতাই দাদার কথা মনে পড়ল। কার কথা আগে লেখা যায় তাই নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। এই চার নিতাইদা আমাদের বাড়ীর সাথে এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং আছেন যে, আমার নিজের দাদাদের থেকেও যেন এনাদের স্মৃতিই আমার বেশী। ছিলেন লেখার কারণ এই চারজনের একজন ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন। তাহলে ঐ প্রয়াত নিতাই দাদার কথাই আগে বলি। অবশ্য এই গতকাল সন্ধ্যায় যে নিতাই দাদা আমার কুশল সংবাদ নিলেন, একেই আমার পরিবার, মানে, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সবথেকে বেশী দেখেছে। আমি নিতাই দাদা বললে, এরা এই ভক্ত মানুষ, কীর্তন এর মূল গায়ক দাদাটিকেই বোঝে। যে দাদা বছর দশেক আগে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর পদবি ছিল দে। আমার জ্ঞান হওয়ার থেকেই এনাকে , হাসপাতালে চাকরী করতে দেখেছি। তখন অবশ্য আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে বসব, এমন সুদূর কোন সম্ভাবনাও ছিল না। এই প্রায় ডাক্তার নিতাইদা আমার বড়দার বন্ধু। আমাদের গ্রামেরই ছেলে। একেবারে শেষ বয়সে বছর দশেক বাদে প্রায় বছর চল্লিশ হবে, হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকতে দেখেছি। হাসপাতাল মানে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্তু আমরা আজন্ম ওটাকে হাসপাতালই বলেছি। আমাদের ছোট বেলার, যখন গ্রামে প্রায় কোন পাকা বাড়ী ছিল না, সেই সময় ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাড়ী আর কোয়ার্টারগুলিই আমাদের বন্যার সময় আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াতো। আর ঐ হাসপাতালের মাঠই গ্রামের খেলার মাঠ। ঐ মাঠে আমরা খেলেছি। এখন আমাদের নাতির মত বাচ্চারা খেলে। আমার বড়দাকে ঐ মাঠে ভলি বল খেলতে দেখেছি; কিন্তু এই নিতাইদাদাকে কখনো মাঠে খেলতে দেখেছি এরকম মনে পড়ে না। মাঠের পাশেই গ্রামের ক্লাব। এক সময় নাম ছিল , উমেশ স্মৃতি পাঠাগার। খুব আবছা মনে পড়ে, ঐ পাঠাগারে একটি কাঁচের জানালা দেওয়া কাঠের আলমারি ছিল। সেই আলমারিতে কিছু বইও দেখেছি। কিন্তু সেই সব বই পত্র বহু যুগ আগেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ঐ পাঠাগার বা ক্লাবে আমিও কিছুদিন ক্যারাম বোর্ড খেলেছি। বড়দা, নিতাইদা আর ওদের কয়েকজন বন্ধু সন্ধ্যায় ক্যারাম বোর্ড বা তাস খেলতে যেত। দিনের বেলায়, বা বিকেলে ওদের কাউকে কাউকে গান বাজনা করতেও দেখেছি। কল্যানবাবু নামে এক জন শিক্ষক গান গাইছেন, আর নিতাইদা তবলায় ঠেকা দিচ্ছেন; এই ছবিটা আজও পরিষ্কার মনে আছে। নিতাইদা যে হেল্থ সেন্টারের খুবই সামান্য একটি পদে চাকরী করতেন, সেটা অনেক পরে জেনেছি। জামা প্যান্ট পরে, বেশ স্মার্ট যুবক, নিতাইদা ওষুধ দিচ্ছে, ইনজেকশন দিচ্ছে এসবই দেখতাম। ডাক্তারবাবু না থাকলে বয়স্ক কম্পাউন্ডার বাবু রুগী দেখতেন। কিন্তু নিতাইদা কখনো ঐ ডাক্তারবাবুর চেয়ারে বসে রুগী দেখতেন না। আমাদের কিন্তু যা কিছু বলার, আগে গিয়ে নিতাইদাকেই বলতাম। যেমন, নিতাইদা, মায়ের জ্বর বা নিতাইদা, সেজদার দাঁতে ব্যথা করছে। তেমন বুঝলে নিতাইদা নিজেই কটা ট্যাবলেট (আমরা বলতাম, বড়ি) দিয়ে দিতেন। নয়তো বলতেন, ঐ ঘরে ডাক্তারবাবু আছেন, দেখিয়ে আয়। মাকে দেখতে আমাদের বাড়ীতেও চলে আসতেন। আমাদের গ্রামের কেউ কিন্তু ওকে কোনোদিন, " ডাক্তর" (ক্ত এ আকার হনেই) বলত না। বহু বছর পরে আমি উত্তর বঙ্গের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী করার সময় দেখেছি, ঐ রকম স্মার্ট যে কোন কর্মচারীকে গ্রামের লোকে , " ডাক্তর" বলে। আর আমরা যারা আসলেই ডাক্তার, তাঁদের বলত, " সার্জন।" নিতাই দা আমাকে ইনজেকশন দিচ্ছেন, বা সাবান জলের "ডুস" দিয়ে আমার কষা পায়খানা বের করছেন, এরকম চিত্র ছবির মত মনে আছে। ওর সাথে অনেক স্মৃতিই আছে, কিন্তু যেটার কথা বললেই আমার পরিচিত প্রায় সবাই বলবেন, " ও এই জন্যই!" না, এই জন্য নয়। আগেই বলেছি, স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত আমি যে সুদূর ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার মত একটা দূর্ঘটনা ঘটাব, সেই রকম জ্যোতিষ কেউ ছিল না। জ্যোতিষ একজন এসেছিলেন বটে একবার। তাঁর সাথে এই নিতাইদার বেশ ঝামেলাও হয়েছিল; কিন্তু তিনিও আমার সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যত বাণী করে যাননি। যে কথা বলছিলাম; আমি তখন বোধহয় ক্লাশ সেভেন বা সিক্স এ পড়ি। সেটা ছিল এক কালী পূজার সন্ধ্যা। কোথায়, কি করে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটাই এক গল্প। আমাকে তো সাপে কামড় দিল। আমি আর শান্তি দাদা

মিনিট খানেক টর্চ নিয়ে খুঁজলাম ; সাপের দেখা গেলাম না। শান্তিদাদা সাইকেল ঠেলে, আর আমি তার পাশে পাশে হেঁটে, একশ মিটার মত ফিরে এলাম। আজকাল হলে তো আমি সাইকেলের পিছনে উঠেই বসতাম। তখন এসব, " নড়াচড়া বন্ধ, কোন বাঁধন নয়, আশ্বস্ত কর, ডাক্তার বাবুকে সবকিছু বল" , (Do it RIGHT) আমাদের জানা ছিল না। এসব কথা জেনেছি এই সেদিন, মাত্রই ২০০৭ সালের পরে। এসব " বাজে কথা" এখন শুরু করলে আর কেউ পড়বেই না। আমরা ঠিক মিনিট তিন চার আগেই দেখে গেছলাম, ' বুলার দোকানে ' , ডাক্তারবাবু, নিতাইদা, দিবাকরবাবু, এইসব বন্ধুরা বাজী কিনছেন। আমি ধীরে ধীরে এসে, নিতাইদাকে বললাম," নিতাইদা, আমাকে সাপে কামড়েছে!" ঐ দেওয়ালিতে বাজী পোড়ানোর উচ্ছ্বাসের মধ্যে এরকম একটা বেরসিক খবর ওদের আনন্দে যেন জল ঢেলে দিল। নিতাইদা চমকে উঠে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, " কি বললি, কাকে সাপে মাকড়েছে ?" আমি একবার," আমাকে " বলবার সাথে সাথে সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। কোথায়? কখন? কি সাপ? দড়ি আন, দড়ি আন, প্রানবন্ধুকে খবর দে! কোথা থেকে একটা দড়ি এনে, দিবাকরদা আমার পায়ে বেঁধে দিলেন। বাজী রেখে সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যতদূর মনে পড়ে, হেঁটেই বুলার দোকান থেকে হাসপতালে ঢুকেছিলাম। আর যেটা পরিষ্কার মনে আছে , আমার এতটুকু ভয় করেনি। প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, ওটা একটা জলঢোড়া সাপ ছিল। যদিও সাপটি শুকনো রাস্তা পেরিয়ে একদিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছিল। শান্তিদা ওর লেজের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যান; ঠিক পেছনেই আমাকে পেয়ে কামড়ে দেয় সাপটা । হাসপাতালে একটা উঁচু ট্রলিতে আমাকে শুইয়ে, উজ্জ্বল আলোর নিচে পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, বিষহীন সাপের কামড়। কী একটা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। জীবনে সেই প্রথম ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন। আমার বেশ গরম লাগছিলো। আর একটা কথা বেশ মনে আছে; আমি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টে ডাক্তারবাবুকে এমন দুই একটা কথা বলেছিলাম যে, উনি চমকে উঠে বলেছিলেন, " কে রে, ও, তুই তো মজুমদার বাড়ীর ছেলে!" অর্থাৎ ঐ বিশেষ বাড়ীর ছেলেকে কামড় দিলেও, সাপও ভেবে চিন্তে বিষ ঢালবে! এখন বেশ ভালো করেই জানি, সেদিন ওটা বিষধর সাপ হলে, আজ আর এই গল্প বলার জন্য এই " মজুমদার বাড়ীর ছেলে" বেঁচেই থাকত না। সেই আদিম যুগে ঐ সব গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড় এর চিকিৎসার কোন প্রশ্নই ছিল না। আর তখন গ্রামের থেকে ষোল সতের কিমি দূরে ডেবরা হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য যা সময় লাগত, তাতে বাঁচার সম্ভাবনা ছিলই না। বাস্তবে, এই ২০২৪ সালে, আমার গ্রাম থেকে ডেবরা হাসপাতালে যেতে আধ ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট মত লাগে। কিন্তু, গ্রামের প্রায় সব বাড়িই পাকা বাড়ী হয়ে গেলেও, হাসপতালের সব কোয়ার্টার ফাঁকা, ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর হাস্পাতাল চত্বরে শেয়াল ডাকলেও লোকে অবাক হবে না। নিতাইদা, মিত্রা মাসী, জামাইবাবু কবেই ইতিহাসে চলে গেছেন। এখনও হাসপাতালের পাশে বাড়ী করে আছেন, বেলা দিদি। হাসপতালের সাথে যুক্ত যে কজনের নাম এখানে করলাম; সবাই আমার অভিভাবক ছিলেন। সকলেই জেনে গেছেন, তাঁদের গ্রামের ছেলে দুলাল, ডাক্তার হয়েছে। সেই দুলাল গোটা দেশ ঘুরে ঘুরে নতুন ডাক্তারদের সাপের কামড় এর চিকিৎসা শেখায়। কিন্তু নিজের গ্রামের নীরদদাদা সময় মত হাসপাতালে পৌছে, সাপের কামড় এর এন্টি ভেনম পেলেও, বেঁচে ফেরেন নি। আসলে তো ঐ ওষুধটাই কাজ করেনি। চাকরী জীবন শেষ করে ফেললাম। এ রাজ্যের নিজস্ব এন্টি ভেনম তৈরীর কাজ "লাল ফিতার ফাঁস" এ যে আটকে পড়ে আছে, এ জীবনে হয়তো আর সেই ফাঁস খুলেছে, এমনটি দেখে যেতে পারবো না। এক নিতাই দাদার কথা বলতেই দু' দিন চলে গেল। বাকী তিনজনের কথা একে একে বলার ইচ্ছা রইল। ১৫.১২.২৪.

নিতাই দাদা 2

চারজন নিতাই দাদার কথা বলতে শুরু করেছি। প্রয়াত নিতাইদার কথা লিখে শেষ করতে দু' দিন লেগেছে। এবার এখনও বর্তমান তিনজনের মধ্যে সবথেকে বয়সে বড় , ধানখালের নিতাই দাদার কথা বলি। এখন অবশ্য এই নিতাইদা বোঝাতে আমরা " শাকালু নিতাইদা " বললেই ভালো বুঝি। ইনিও আমার বড়দার বন্ধু। এঁদের বাড়ী আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে তিন চার মাইল উত্তরে, ধানখাল গ্রামে। বড়দা বা তার বন্ধুদের আমি স্কুলে পড়ার সময় দেখিনি; ওরা আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই স্কুলের পাট (পাঠও) শেষ করেছেন। আমি জ্ঞান হওয়ার থেকেই এই ধানখালের নিতাইদাকে দেখছি। আমাদের বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান থাকলে নিতাইদা হাজির থাকতেনই। বিশেষ করে বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হলে, নিতাইদার বাড়ী থেকে "ভারি" আসতো। একজন জোয়ান লোক, বাঁকের দুই দিকে দুটি বড় ঝুড়িতে ভর্তি করে আনাজ পত্র নিয়ে হাজির হত। বেশ ছোটবেলা থেকেই, মানে যখন আমরা রাস্তা চিনে নিজেরা হেঁটে যেতে পারতাম, তখন থেকেই আমি আর আমার ছোট ভাই কুচুন চার ছয় মাস বাদে বাদে একবার ধানখালে নিতাইদাদের বাড়ী চলে যেতাম। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। প্রতিবারই নিতাইদার মা, আমাদের কিছু একটা সন্ধি দিয়ে বলতেন, এটা মায়ের জন্য নিয়ে যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওটা একটা পাকা মিষ্টি কুমড়া, যাকে ওদিকের লোকে বলত, " বইতাল।" ওরা বেশ বড় চাষী ছিলেন, এটা ঐ ছোটবেলাতেও বুঝতাম। একবার ওদের মাটির বাড়ীর পিছনের দিকের টানা বারান্দায় এক দর্শনীয় জিনিস দেখেছিলাম। বারান্দাটা একটা লম্বা ঘরের মত; বোধহয় দেড়শ ফুট মত লম্বা। গোটা ঘরটা বইতালে ঠাসা; হয়তো বা দুই- চার ট্রাকের মত হবে। পরে অনেক হাটে বা গ্রামের রাস্তার মোড়ে কুমড়োর ছোটখাট পাহাড় দেখেছি। কিন্তু সেই একসাথে, চার ট্রাক কুমোড়ো; তেমন দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। এখানে আর একটা কথা বলি। এই মেদিনীপুরের বৈতাল বাঁকুড়ায় গিয়ে " ডিংলা" হয়ে যায়। নিতাইদা কতো বড় চাষী সেটা বুঝতে বুঝতে আমি স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে, মেদিনীপুরের চোখের হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে গেলাম। মাঝে বেশ কিছু বছর নিতাইদা বা তাঁর মায়ের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। মেদিনীপুরের এক নার্সিং হোমে একদিন হঠাৎ দেখা নিতাইদার সাথে। বললেন, মায়ের চোখের জন্য এখানে এসেছি। মেদিনীপুরের সে সময়ের সবথেকে বিখ্যাত চোখের ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় আছেন ওনার মা। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, ওনার মায়ের চোখ বহু বছর ধরেই অন্ধ হয়ে আছে। এবার কিছু একটা ইমারজেন্সি হওয়ায় শহরে ছুটে এসেছেন। আর, উনি একটু অপ্রস্তুত হলেও, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি যে, উনি আমার খবর সবই জানতেন; কিন্তু নতুন ডাক্তারের ওপর ভরসা না করে শহরের সবথেকে বিখ্যাত ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকেছেন। ওনার সাথে আমাদের বাড়ীর এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, আমার তখনকার বাসায় ওনাকে যেতে বলতেই হল। পরদিন সকালে উনি আমার সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠান এর ভেতরের কোয়ার্টারে এলেন। আমাদের সেই, সবে শুরু করা নতুন সংসারে, অতিথি আপ্যায়ন এর বিশেষ কোন ব্যাবস্থা ছিলনা। আমার স্ত্রী ওনাকে চা বিস্কুট দেওয়ার পর, মুড়ি খাবেন কি না জানতে চাইলে উনি জানালেন, মুড়ি খেয়েই এসেছেন। আমার স্ত্রী ওকে সেই প্রথম দেখলেও, উনি বড়দার বন্ধু সেই সম্পর্কে আমার বেশ মান্য ব্যক্তি, এটা বুঝেছিল। আমাদের বাসায় তখন বিশেষ কোন খাদ্য বস্তু ছিল না। আমাদের কাছে একটু স্পেশাল একটি জিনিসই ছিল। শাকালু। আমার স্ত্রী

সেই মহার্ঘ বস্তু (অবশ্য আমাদের কাছে) কেটে, বেশ গুছিয়ে , প্লেটে সাজিয়ে ওনাকে পরিবেশন করল। আর তাই দেখে দাদাতো হো হো করে হেঁসে উঠলেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, আরে তুমি আমাকে শাকালু খেতে দিয়েছ? আমার দু বিঘা জমিতে শাকালু চাষ করা হয়েছে। ওনার মা নার্সিং হোমে ভর্তি থাকার সময়, উনি আর একদিন আমাদের বাসায় এসেছিলেন। দুটি বিশাল সাইজের ফুলকপি এনেছিলেন। ঐ রকম বড় ফুলকপি সহসা দেখা যায় না। আমার স্ত্রীর কৌতহল মেটাতে বললেন, আমার এবার দশ হাজার ফুলকপি লাগানো আছে। ভাতৃ দ্বিতীয়ার আগে থেকে বাজারে বিক্রী করতে পাঠাচ্ছি। ওনার মায়ের সাথে একদিন কথা হল। আমি ঐ নার্সিং হোমের ওটিতে কোন অপারেশন করতে ঢুকতে চাইছিলাম; শুনলাম সেই বড় ডাক্তারবাবুর কোন রুগীর চোখের ব্যাণ্ডেজ পাল্টানো চলছে, সেই ওটিতে। দরজায় উকি দিলাম। ডাক্তারবাবুর দুই সহযোগী, নিতাইদার মায়ের চোখেই ব্যাণ্ডেজ পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। ওদের কথায় বুঝলাম, নতুন ডাক্তরটি ঐ মহিলার কেমন যেন আত্মীয় হয়, এই খবরটি ওরা আগেই পেয়েছেন। আমাকে দরজায় দেখে, রোগিনীকে ওরা জানালেন, আপনাদের আত্মীয় ডাক্তারবাবু এসেছেন। আমাদের সেই সময়ের ভদ্রতার খাতিরে আমি ভেতরে ঢুকে, অন্য ডাক্তারবাবুর রুগীর চোখ দেখতে পারি না। কিংবা, বড় ডাক্তারবাবু কিছু মনে করবেন, এরকম ভেবে, ভেতর ঢুকলাম না। দরজায় দাঁড়িয়েই বললাম, মাসিমা, আমাকে চিনতে পারলেন? আমি প্রানবন্ধুর ভাই। এর মধ্যে নিতাইদা নিশ্চয়ই ওনাকে আমার কথা জানিয়েছেন। মাসীমা ওটি টেবিলে শুয়েই বললেন, " কে? কালু?" কালু আমার উপরের দাদার ডাক নাম। আমি জানালাম, " আমি দুলাল।" আমাদের পোশাকী নাম ওনার জানার কথা নয়। বয়স্ক মানুষের স্বভাব মত, নিজের কষ্টের কথা, আমাকে চিৎকার করে জানালেন। এর থেকে বেশী সময়, ঐ বড় ডাক্তার বাবুর রুগীর সাথে কথা বলতে ভরসা পেলাম না। দুই তিনদিন পর কবে ওনাকে নিয়ে, নিতাইদাদা বাড়ী ফিরে গেছেন, আমার জানা হয়নি। এবার বছর দশেক পর, আমাদের বাড়ীতে নিতাইদাদার সাথে দেখা হয়েছিল। আমাদের মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উনি এসেছিলেন। সে তো এই সেদিনের কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু হিসেব করে দেখছি, একুশ বছর পেরিয়ে গেল। আমরা মাকে, বাবার পাশেই সমাধিস্থ করে, পুকুর ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান করার পর , সব ভাইয়েরা একে একে নিতাইদার কাছ থেকে, শুরু দশার কাছা ইত্যাদী নিলাম। সেই প্রথম, আর সেই শেষ, আমি গলায় একটা সাদা থানের ফিতা দিয়ে লোহার চাবি কাঠি ঝুলিয়েছিলাম। নিতাইদা দিয়েছেন; ওটাই লোকাচার, তাই ওটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম। ঐ সময়ই কোন একদিন দাদা বলেছিলেন, ওনার মা মেদিনীপুর থেকে ফিরে বেশীদিন বাঁচেননি। মায়ের কাজের পর থেকেই আমারও গ্রামের বাড়িতে যাওয়া কমে গেছে। পরে বোধহয় আর কখনও নিতাইদার সাথে আমার দেখা হয়নি। সেই সময় দাদা একটি মজার কথা আমাকে বলেছিলেন। ওনার ছেলেরা কি করে? পড়াশুনা কি করেছে? এসব জানতে চেয়েছিলাম। উনি বললেন, " ছেলে, এস -ঠায় -পায়!" আমরা যারা একেবারেই হদ্দ গ্রামের থেকে বেরিয়েছি, তারা জানি ওটার মানে কি! সবার এটা জানার কথা নয়। এখন তো এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় উঠেই যাচ্ছে। আমরা গ্রামে দেখেছি; লাঙ্গল করার সময় চাষীরা এই রকম বিচিত্র ভাষায়, হালের বলদের সাথে কথা বলেন। বেশ কয়েক বছর পর, এই এস - ঠায় - পায় পাশ করা ছেলেটি মূলত যে কাজ করে, জেনে বেশ কৌতুক বোধ করি। গ্রামের বাড়িতে যে ভাইপো থাকে, তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, নিতাইদা কেমন আছেন?

ভাইপো জানাল, তাঁর অবস্থাও ভালো না, প্রায় শয্যা নিয়েছেন। ফোন নম্বর পেয়ে ফোন করলাম। খুশী হলেন। জানালেন যে, এখন আর বাইরে যেতে পারেন না। ছেলেরা " দালান" বাড়ী করেছে। একবার যেতে বললেন। ছেলে এখন করে কি? দাদা কিন্তু বেশ স্মার্ট। বললেন, " ছেলে এখন ভেলোরের দালাল হইছে, মাসে দুবার করে লোক লিয়ে ভেলোর যায়। সম্পন্ন চাষী নিতাইদার ছেলে; বেশ একটা নতুন পেশার সন্ধান পেয়েছে। ওদের ঐ বিঘার পর বিঘা জমিতে সবজি চাষের কি ভবিষ্যত? জিজ্ঞেশ করতে সাহস পেলাম না।১৬.১২.২৪.

ধানখালের নিতাইদা

নিতাই দাদা ৩

দুই বয়োজ্যেষ্ঠ নিতাই দাদার পরে এবার যে দুজনের কথা বলব এরা দুজনই আমার সেজদার মত হবেন, বয়সে। যে গল্পটা "শাকালু নিতাইদার" কথায় বলতে ভুলে গেছলাম; এই ধানখালের নিতাইদার দাদা ছিলেন, গৌরদাদা। শুনেছিলাম, ধানখালে এইরকম চার বা পাঁচ জোড়া নিতাই - গৌর ছিলেন। ধানখালের এই গৌরদা প্রায় বছর পঁচিশ আগে প্রয়াত হয়েছেন। এই দাদার কাছে " নেংটি ভূতের গল্প" শুনেছিলাম। না, একবার ভূতের গল্প শুরু করলে আর সব কথা কাহিনী মার খেয়ে যাবে; এজন্য এখানে আর ঐ গল্প করলাম না।

এবার যে নিতাইদাদার কথা বলব তার দাদাও একজন গৌরদাদা। এখানে কিন্তু এই গৌরদা আমাদের বাড়ীর ছেলের মত ছিলেন। গৌরদা আমার মেজদার বন্ধু। অবশ্য অনেক বছর পর, এঁদের সাথে আমাদের পরিবারের একটা কুটুম্বিতা হয়েছে। আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে, গৌরদাদার শ্বশুর বাড়িতে। নিতাইদাদাদের মত আমার বেশ কাছের কয়েকজন গৌর বা গৌরাঙ্গও আছে। আগে নিতাইদাদার গল্প শেষ করি। আগে কয়েকবারই বলেছি; আমি প্রথম কলকাতায় এসে এক বিচিত্র জায়গায় থেকেছি। সাধারণ ভাবে বুঝতে সুবিধা হবে বলেই আমি বলি, " মেসে থাকতাম।" আসলে ওটা ছিল আমার বাবার এক বন্ধুর কোম্পানির আপিস ঘর। দোতলায় একটা দুই ঘরের ফ্ল্যাট ওদের আপিস। আর নিচে সামনের বাড়ীতে কারখানা। মেজদা কলেজে পড়ার জন্য কলকাতায় এসে, ঐ আপিস ঘরে আশ্রয় পায়। বাবার বন্ধু, সেই সেন কাকুর এটুকু মহানুভবতা না হলে মেজদা হয়তো কলকাতার কলেজে পড়ার সুযোগ পেতো না। আর মেজদা কলকাতায় এসে ঐ আশ্রয় না পেলে আমারও কলকাতার স্কুলে পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। আবার আমারও ঐ ডেরায় আশ্রয় জুটে যাওয়ায়, গৌরদা তাঁর ভাইকে প্রাথমিক আশ্রয়টা ওখানে নিতে বলতে পারেন। এই সেই আমার রাতের ডেরার সহযাত্রী নিতাইদা। এর জীবনের উত্থান পতনের গল্পও " হিন্দি সিনেমার মত!" অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এই নিতাইদাদা ক্লাশ সেভেন বা এইট এ পড়ার সময় ওদের এক পারিবারিক বিপর্যয়ে, ওদের সবার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তিন চার ভাই অমানুষিক পরিশ্রম করে বছর পাঁচ - ছয় পরে একটু পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পান। সেই সময় বড় ভাই গৌরদার ইচ্ছায়, কিংবা (এবং) পুরনো স্কুলের হেড স্যারের আগ্রহে, নিতাইদা আবার পড়াশুনা শুরু করেন। মাঝের ঐ বন্ধের সময়টা আট - নয় বছরও হতে পারে। এতদিন পরে শুরু করলেও, নিতাইদা খুব ভালো রেজাল্ট করে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। এই সময় মেজদার সেই রাতের আশ্রয়ে প্রাথমিক মাথা গোঁজার সুযোগ পেয়ে, নিতাইদা কলকাতার একটি কলেজে, ভূগোলে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে যান। আমরা দুজন ছাত্র। সকালে উঠে স্নান করেই মেজদা বেরিয়ে যেতেন টিউশন করতে। সন্ধ্যায় দুই একটা টিউশন সেরে ফিরত। সেন কাকুর আপিসের লোকজন আসার আগেই আমরা দুই ছাত্র স্কুল কলেজে বেরিয়ে যেতাম। আমরাও ফিরতাম, আপিস ছুটির পরে। সকালে আমরা দুই ছাত্র একসাথে টিফিন খেতাম। সেই ব্রেকফাষ্ট ঠিক আমাদের আশ্রয় স্থানের সাথে মিল রেখেই হত। দুপুরে রাত্রে আমার আর মেজদার খাওয়ার একটা আলাদা জায়গা ছিল। পাড়ার ভেতর দিয়ে, মিনিট দশ বারো হেঁটে সেই, "মৃত্যুঞ্জয় জানার" হোটেলে আমরা খেতে যেতাম। আমি অবশ্য সকালে দশটা নাগাদ, সেই হোটেলে খেয়ে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে বাস ধরে, শ্যামবাজার এর কাছে স্কুলে চলে যেতাম। রাত্রে যেতাম মেজদার সাথে। আমাদের ঐ খাওয়ার হোটেলের খরচ ছিল, মাসে নব্বই টাকা, মাথা পিছু। নিতাইদার কিন্তু ঐ নব্বই টাকা মাসে মাসে খরচ করার সামর্থ ছিল না। খুব অল্প দিনেই , মেধাবী আর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে , নিতাইদা কলেজের প্রফেসরদের চোখে পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের জীবন কোন পথে চলবে, কে বলতে পারে? এরকম বেশ কিছু মানুষকে খুব সামনে থেকে দেখেছি। তাই " ভবিতব্য" কথাটাকে অস্বীকার করার সাহস আমার নেই। নিতাইদা উত্তর কলকাতার কোন পুরনো রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ির, দরিদ্রনারায়ণসেবার লঙ্গরে দুই বেলা খেতে যেতেন। কলকাতায় থাকা আর পড়াশুনার জন্য ওকে বোধহয় প্রতি মাসে, চল্লিশ পঞ্চাশ টাকাও বাড়ী থেকে পাঠাতে পারতেন না। সেই টাকাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। মেরেকেটে মাস চারেক বোধহয় উনি কলকাতায় ছিলেন। তারপর হঠাৎ করে একদিন বাড়ী ফিরে গেলেন, আর এলেন না। সে সময় আমারও গ্রামের বাড়িতে খুব একটা আসা হতো না। উনি সম্ভবত বাড়ী ফিরে আবারও চাষের কাজে লেগে যান। আমি কলকাতা থেকে বাঁকুড়ায় চলে গেলাম, মেডিক্যাল কলেজে পড়তে। প্রায় বছর আট দশ পরে,

বড়দার কাছে শুনেছিলাম, নিতাইদা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের চাকরী পেয়েছেন। এই " চাকরী পেয়েছেন" কথাটা যতো সহজে লিখে দিলাম, কাজটা ততোটাই কঠিন ছিল। চাকরিটা পাওয়ার জন্য ওনাকে প্রায় ভিটামাটি বিক্রী করতে হবে, এমন অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় উনি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। এমনকি আমার বড়দার মত সামান্য বেতনের চাকরি করা মানুষের কাছেও সাহায্য চেয়েছিলেন; এইটুকুই আমি এখন লিখতে পারলাম। বিস্তৃত লেখাটা এখন "পলিটিক্যালি ইনকরেক্ট " হবে। কিছু লোক বলবে, ঐ তো, "সব পাখী মাছ খায়, দোষ হয় শুধু মাছরাঙার!" নিতাইদা বেশ কয়েক বছর আগে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রায় চল্লিশ বছর পর একবার ওনার সাথে দেখা হল। ওনার বাবা ঠাকুর্দার ভিটায় তৈরী দালান বাড়ীর দোতলায় উঠে পিছনের দূর মাঠের দিকে চেয়ে মনেপড়েছিল কি, বছর পঞ্চাশ আগে ঐ মাঠ পেরিয়ে আমরা গৌরদার বাড়ী যেতাম? নিতাইদার ছেলেই সে সময় MSc পাশ করে গিয়েছে? ওরা প্রায় জ্ঞান হওয়ার থেকেই জানে, ওদের কুটুম্ব যোগেশ আর তার শ্যালক ডাক্তার। ওদের বাড়ী গেছলাম, যোগেশের গাড়ী চেপে। ওর বাবাকে একটা ভদ্রস্থ চাকরী করতে দেখেছে। ওকে এখন সেই ১৯৭৭ সালের গল্প বললে কেমন লাগবে ওদের? ওরা কি আদৌ বিশ্বাস করবে, এই গাড়ী চড়ে আসা ডাক্তার আর ওর বাবা একদিন পঁচিশ পয়সার একটা স্লাইস রুটি ভাগ করে খেয়েছে? হ্যাঁ, শুধুই পাঁউরুটি; সেঁকে নেওয়ার সুযোগও ছিল না। কোনদিন সাথে একটা দশ পয়সার সিঙ্গাপুরী কলা পেয়ে গেলে তো সেটা প্রায় উৎযাপন করার মত ব্যাপার হত। আমাদের দু'জনের আর্থ সামাজিক অবস্থান বিপুল ভাবে পাল্টে গেছে। আর বাকী রইল একজনই নিতাইদা। তাঁর যে উন্নতি হয়েছে, আমার মত বৈষ্ণব বাড়ীর ছেলের কাছে সেটা সাধনার ফল। কৃষ্ণের কৃপা না হলে এটা পাওয়া যাবে না। ১৭.১২.২৪.

নিতাই দাদা 4

জয় নিতাই। জয় জগদ্বন্ধু। এই একটু আগেই, আবার একটি সমাপতন হল। মোবাইলটা চার্জে বসিয়ে ভাবছিলাম, ভক্ত নিতাইদার কথা। মোবাইল চার্জে বসানোর আগেই দেখলাম, আমার স্কুলের সহপাঠী বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক, ডক্টর সেন লিখেছেন, আমার আগের পর্ব পড়ে জেনেছেন, আমি বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। "বৈষ্ণব পরিবারের" মানুষ বললেই আমার এখন মনে পড়ে, প্রখ্যাত মহাভারত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই এর কথা। ওনার লেখায়, ইউটিউব ভাষণে কয়েকবার বলেছেন, উনি বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। ওনার লেখায় বা কথকতা শুনতে শুনতে যখনই আমাদের পরম গুরু, বাবা মায়ের গুরুদেব বৈষ্ণবাচার্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের নাম শুনি, মনে হয় দিনটি পবিত্র হল। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হল হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। সাথে দুটি বাল গোপাল চলেছে। এরা কেউ সফর সঙ্গী হলে, ট্রেনের দীর্ঘ ভ্রমণ আনন্দময় হয়ে যায়। সেও এক রকম, বাল গোপাল এর কৃপা। এদের একজনের "বালভাসিতম অমৃতম্" শুনতে শুনতে চলেছি। ওর সাথে পাশের একটি কিশোরী কন্যা বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সেই দিদির কোলে বসে, এই শিশুটি হঠাৎ বলল, আমি হাত দিয়ে বাঁশী বাজাতে পারি। ওর ঐ কথাগুলি এতই অস্পষ্ট যে, মেয়েটি বা তার মা বুঝতে পারছিল না। দুই তিন বার কি করতে পারিস, জিজ্ঞেস করায় ও বলল, " কিন্নোর মটো বাচি বাজাই।" ঐ বাঁশী আর কিন্নো মিলিয়েই বুঝলাম , এ সেই পরম করুণাময় শ্রী কৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলছে। সে বাঁশী তো কোন সুদূর অতীত থেকেই বেজে চলেছে; শুনতে পায় কজন? যে শুনতে পায়, সে তো কৃপা ধন্য।

আমার এই নিতাইদাদা আমার প্রাইমারী স্কুলের গ্রামে থাকেন। উনি কিন্তু আমার সেই প্রাইমারী স্কুলের বন্ধু, নিত্য রুদ্রের দাদা। সেই বছর তিনেক নিত্যই আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তারপর কিন্তু নিত্যর সাথে প্রায় দেখাই হয় না। বছর চল্লিশ আগে একবার ওর সাথে দেখা হয়েছিল, এক অদ্ভুত অনভিপ্রেত পরিবেশে। তখন নিত্য শাসক দলের ছোটখাট নেতা। কিন্তু আমি যতোদিন গ্রামে ছিলাম এই নিতাইদাদাকে আমি প্রায় চিনতামই না। গ্রামের বাড়িতে কীর্ত্তন হলে মূলত প্রফুল্লদাদা তাঁর দল নিয়ে আসতেন। সে সময় ঐ দলে অন্য আরও পাঁচ সাত জনের সাথে এই নিতাইদাদা আসতেন, এটা পরে জেনেছি। প্রফুল্লদাদা বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মূল গায়েন ছিলেন। তারপর সেই দল দুই ভাগ হয়েছে। একটি দলের মূল গায়েন এই নিতাইদাদা; অন্য দলের মূল গায়েন মদন দে। আমাদের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হলে, এঁদের দুটি দলই আসত। কিন্তু ছোটখাট সান্ধ্য আসরে নিতাইদাদাই গান গাইতেন; তাও বোধহয় বছর চল্লিশ হবে। এই গত সপ্তাহেও ওনারা আমার ছোট ভাই তন্ময় এর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, কলকাতায় এসেছিলেন।

নিতাইদার বাবা মারা গেছেন আমরা যখন ক্লাশ টুতে পড়ি। আসলে নিত্যর বাবা মারা গেছেন, সেই খবরটা জানতাম। ওনারা গ্রামের সামান্য চাষী ছিলেন। তখন তো ওসব মহা দুর্ঘটনার তাৎপর্য বুঝতামই না। যতদূর মনে পড়ে, স্কুল থেকে একদিন বা দু 'দিন আমি ওদের বাড়ী গেছলাম। একদিন নিত্যর মা আমাকে শ্যামা চালের পায়েস খেতে দিয়েছিলেন। ওদের বাড়ী নিয়ে আর কিছু মনেই পড়ছে না। নিতাইদার কীর্ত্তন আমি গ্রামের বাড়িতে বেশ কয়েকবার শুনেছি। প্রায় বাইশ বছর আগে, আমি ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটটি কেনার পর, নিতাইদাদার সম্প্রদায়কে আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন করার জন্য ডেকে এনেছিলাম। ওরা বোধহয় সেইবারই প্রথম, কলকাতায় আসেন। তাই ওদের নিয়ে বড়দাও এসেছিলেন। আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে এত লোকের রাত্রে থাকার অসুবিধা হবে, তাই আমি পাড়ার মধ্যেই একটি ছোট লজে ওদের জন্য দুটি রুম এর ব্যবস্থা করেছিলাম। রাত্রে কীর্তন শেষে, খাওয়া দাওয়ার পর ওনাদের ঐ লজে গিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা। এটা জেনে, নিতাইদা আমাকে বলেছিলেন, " ভাই, তুমি আমাকে নিজের লোক ভাবতে পারোনি।" তারপর থেকে ওনারা বেশ কয়েকবার আমার কলকাতার বাসায়, আর ভাই দাদাদের বাসায় কীর্ত্তন করার জন্য এসেছেন। আমরা আমাদের বাসাতেই ওদের জন্য ঢালা বিছানার ব্যবস্থা করেছি। আমার বাসায় বার দুই কীর্ত্তন করে যাওয়ার পর, একদিন বেশ সকালে আমি আমার গ্রামের

বাড়ির উঠানে ঘুরছিলাম। সেটা একটা শরৎ কালের সকাল। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে একশ মিটার দূর দিয়ে চলে গেছে বাস রাস্তা। বেশ দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, করতালের শব্দ আর অস্পষ্ট কীর্ত্তন। কিছুটা কাছে আসার পর বুঝলাম , নিতাইদা নগর সংকীর্তন করে আসছেন। উনি বাসরাস্তা ছেড়ে আমাদের বাড়ীর দিকে নেমে এলেন। আমাদের বাড়ীতে ঢোকার আগেই, ডান হাতে বাবা মায়ের সমাধী মন্দির। নিতাইদা ঐ দুই ভক্ত বৈষ্ণবকে কীর্ত্তন শোনাতেই এসেছিলেন। পরে শুনেছি, উনি আমাদের গ্রামের অন্য প্রান্তের, বৈষ্ণব গঙ্গাধরবাবুর বাড়ীর হরিমন্দির পরিক্রমা করে ফিরছিলেন। আমাকে দেখে, কীর্ত্তন না থামিয়ে, একবার "হরিবোল" বলে আমাকে উইশ করেছিলেন।

এই যে নিতাইদা , আমার বাবা মায়ের সমাধিতেও কীর্ত্তন শোনাতে আসছেন এটাই আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য। আশেপাশের পাঁচ সাত গ্রামে আমার বাবা একজন পরম বৈষ্ণব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই আদিম যুগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা, ভিখারীর ঠিক উপরের স্থানে ছিল। সেইরকম একজন শিক্ষক কতোটা পেনশন পেতে পারেন, সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সময়ও বাবা মায়ের একটাই সখ বা ইচ্ছা ছিল ; মাঝে মাঝে "প্রভুর কীর্ত্তন" করানো। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে একটু সমস্যাও দেখা গেছে। মা একবার প্রফুল্ল দাদাকে ডেকে বললেই, সব হয়ে যেত। কত কম সামর্থ নিয়েও, শুধুই "প্রভুর ইচ্ছায়" মা বাবা সেই সব দিনে ওরকম একটা কীর্তনের আসর বসিয়ে দিতেন, এখনও ভাবলে অবাক হয়ে যাই। মা বাবা চলে যাওয়ার পর গত বছর পঁচিশে আর সেরকম, অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন করানোর সাহস হয়নি আমাদের। নিতাইদার সম্প্রদায় অনেক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন তিথিতে, আমাদের গ্রামের বাড়ীতে কীর্ত্তন করে গিয়েছেন। আমি তো বেশ কম বয়সের থেকেই, প্রফুল্লদাদা, বসনবাবু, ধ্রুববাবুর কীর্ত্তন শুনে এসেছি। আমাদের বাড়ীতে, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মহানাম সংকীর্তন হয়। নিতাইদাদার গুরুস্থানীয় যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা সবাই ওদিকের বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারনেই হোক, নিতাইদাদার কীর্ত্তন আমাদের মুগ্ধ করে। ঐ যে একবার ওনাকে গ্রামের রাস্তায় নগর সংকীর্তন করতে দেখেছিলাম, তার পরের বছর থেকেই সম্ভবত উনি প্রতিবছর ঐ সময়, এক মাসের জন্য বৃন্দাবনের গোবর্ধন পরিক্রমায় চলে যান। ঐ মাসটি বোধহয়, অদ্বৈত মাস বা ঐ রকম কিছু একটি নামে পরিচিত। এই বছরই ঐ বিশেষ মাসের মধ্যে একবার কলকাতায়, আমার ছোড়দার বাসায় প্রভুর কীর্ত্তন হল। নিতাইদা আসতে পারেননি। কীর্ত্তন হল; কিন্তু যেন কেমন একটা লবণ বিহীন তরকারীর মত। বেশ বুঝতে পারি, কেন আমার ছেলে মেয়ে অন্য কারো কীর্ত্তন শুনতে চায় না। ওদের কিন্তু খুব একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতও শুনতে দেখিনা। মেয়ে তো কখনও বাংলা গানই শোনে না। আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমার বাসায় নিতাইদা কীর্ত্তন শুরু করলে আমি মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। যুক্তিবাদী বিচারে এসব একেবারেই বাজে আবেগের কান্ড। আমি অমৃত্যু এই আবেগ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা অনেক আগেই জেনেছি, নিতাইদা দীক্ষিত, অনেক নিয়ম নিষ্ঠা মেনে চলেন। অনেক সাধু মহাত্মা ,"শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে" খেতে নিষেধ করেছেন। তার স্মৃতি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও আছে। সব জেনেও, আমি এখনও ওটা মানতে পারিনি। এবারই দেখলাম, নিতাইদাদা ওটা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন। এই কয়েক মাস আগেই তো উনি আসতে পারলেন না। ভাই এর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উনি না এলে আমরা কিছুই মনে করতাম না। উনি কিন্তু এলেন। কীর্ত্তন করলেন। ভাইয়ের বাড়ীতে ঐ শোকের পরিবেশে বসেও, আমার মনে হয়েছে, মা এসে সেই কীর্ত্তন শুনে গেলেন। নিতাইদার কীর্ত্তন শোনার জন্য আরও অনেক বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা আছে। প্রভুর ইচ্ছা থাকলে তাই হবে। ভক্ত কবি জয়দেবের কলমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে লিখে দিয়েছিলেন, " দেহী পদপল্লবমুদারম !" কীর্তনের আসরে বসলে, নিতাইদার কন্ঠেও যেন কেউ উপস্থিত হয়ে যান। ধন্য তোমার সহজ সাধনা। নিতাইদা, তুমি ধন্য। আবার তোমাকে প্রণাম করবার জন্য অপেক্ষা করছি। ১৭.১২.২০২৪.

নিতাই দাদা

নিধিরাম সর্দারের আমলাগিরি

ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল সরকারী চাকরী। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কতো বিচিত্র মানুষের সাথে দেখা হয়েছে, কতো বিচিত্র সহকর্মীর সাথে কাজ করেছি। আজও , প্রতিদিন কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সৌভাগ্য যে, সব কথা , সব ঘটনা মনে থাকে না । তা না হলে এত লক্ষ কোটি তথ্যের ভারে সবাই পাগল হয়ে যেত। তবুও মাঝে মাঝে এক একটা পুরাতন ঘটনা মনে এসে যায়। ঘটনার খুঁটিনাটি সব স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কিন্তু ঐ ঘটনার কুশীলবদের কারও কারও নামটা আর কিছুতেই মনে করা যায় না।

আমরা যখন সরকারী চাকরীতে যোগ দিই তখন অনিয়মগুলিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি ব্লকের সবথেকে সিনিয়ার ডাক্তারেরই ব্লক মেডিক্যাল অফিসার হওয়ার কথা, নিয়ম মত। কিন্তু , অন্তত আমার ঐ জেলায় গিয়ে দেখি সিনিয়াররা সব দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন একটা কাউকে ধরে সবথেকে দায়িত্বপূর্ন পদটিতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে স্বাভাবিক ভাবেই যে সব সমস্যা হওয়ার কথা তাই হত। যে সব সিনিয়ার কৌশল করে দায়িত্ব এড়িয়ে যেত , তারাই একটা নতুন ছেলের " খবরদারি" মানতে চাইত না। এছাড়া ডাক্তারী করা আর আমলাগিরি করা এক কাজ নয়। মেডিক্যাল কলেজ থেকে আমরা রুগী দেখে চিকিৎসা করা শিখে বেরোতাম ; আমলাগিরি তো কোথাও শেখানো হত না। ভুল করতে করতে যতোদিনে একটু আমলাগিরি শিখে নিতাম , ততোদিনে ঐ পদ ছেড়ে সরে পড়ার কায়দাটাও শেখা হয়ে যেত।

প্রথম যে জায়গায় আমলার পদে যোগ দিলাম সেখানে মাস ছয়েক টিঁকতে পেরেছিলাম । একটা কথা খুব তাড়াতাড়িই শিখে গেছলাম ; কাউকে কাজ করতে বলা যাবে না। উপরোয়ালারা চাইবেন সব কাজ যেন গুছিয়ে হয়ে যায় । আর সহকর্মী আর অধস্তনরা চাইবে , কাজের কথা যেন না বলি। এভাবেই চলতো দিনগত পাপক্ষয়। কিন্তু সবদিন তো আর সমান যায় না। এক একটা ঘটনা বেশ ঝামেলায় ফেলে দিত। নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় যতোটা পারা যায় মেটানোর চেষ্টা করতাম। নামে আমলা হলে কি হয়; আসলে যে নিধিরাম সর্দার,সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়িই বুঝে গেছলাম।

প্রথম জায়গায় আমলাগিরি করতে গিয়ে বোকার মত অনেক বেশী দায়িত্ব সামলে নিয়েছিলাম। সেই বদনামটা কপালে লেখা হয়েই থেকে গেল। তাই যতোই পিছলে বেরোনোর চেষ্টা করি , আবার একটা জায়গায় জরুরী দরকার পড়তেই আবার আমার গলায় ' ছাগলের দড়িটা' পরিয়ে দেওয়া হল। ততোদিনে অবশ্য পদটার আঁতঘোত অনেক জেনেও ফেলেছি।

একদিন দুপুরে একসাথে চারজন দিদিমনি আমার কাছে কাজে যোগ দিতে এলেন। চার জনই বেশ কম বয়সি। সবে পাশ করেছেন; প্রথম পোষ্টিং। চার জনই দক্ষিন বঙ্গের। বাড়ী থেকে চারশ কি মি দূরে চাকরী করতে এসেছেন। যার যা কপালে লেখা আছে , কে খন্ডাবে। এই চার জনের

মধ্যে একজন বেশ মুখরা, আর একজন স্মার্ট। এদের দুজনের কাজের জায়গা আমার সাথেই, ব্লক হাসপাতালে। আর যে দুজন একটু গোবেচারা তাদের কাজের জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে আরও পনের কি মি দূরের একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ব্লক হাসপাতালে একটা দেওয়াল ফাটা ডাক্তারের কোয়ার্টার ছিল। প্রথম দুজনকে বললাম , ওখানে থাকতে পারেন ; আর কোন কোয়ার্টার খালি নেই। তখন ওদের আর কিছু ভাবার মত অবস্থাও ছিল না। কদিন পরেই বুঝেছিলাম , ওদের ঐ দেওয়াল ফাটা কোয়ার্টারই প্রাসাদ মনে হতে পারে কারো কাছে। বেচারা দু'জনকে যেতে হল আরও প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতরের কোয়ার্টারে।

ইটাহারে আমার তৈরী বাগান

বোধহয় দু'সপ্তাহও হয়নি। এক দুপুরে ঐ দুই গোবেচারা দিদিমনি এসে প্রায় কেঁদে পড়লেন। ওনারা আর ঐ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টারে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। আগের রাত্রে ওদের কোয়ার্টারের জানালার উপরের খড়খড়ি তুলে , কেউ টর্চের আলো ফেলেছে। এবার কি করি? এই হল আমলাগিরির এক একটা চ্যালেঞ্জ। ঐ মাঠের মধ্যে কোয়ার্টার, এরকম হলে তো যে কোন মহিলাই ভয় পাবে। ওদের নিরাপত্তার জন্য কি বা করতে পারি! অগত্যা ওদের দুজনকে থানার বড়বাবুর কাছে পাঠালাম। ওদের সাথে আগের সেই স্মার্ট দিদিমনিকে যেতে বললাম। থানার বড়বাবু আমাদের খুবই কাছের মানুষ। দিদিমনিদের বললাম, যান বড়বাবুর কাছে। ওনাকে সবই বলবেন । দেখি উনি কি বলেন।

মিনিট পনের পরেই থানা থেকে বড়বাবুর ফোন । "আরে ডাক্তার সাহেব , আপনার লক্ষী তো ঘরে থাকতেই চাইছে না , আমি আর কি করব!" এটা বুঝলাম, দিদিমনিরা আর ঐ গ্রামের কোয়ার্টারে যেতে চাইছেন না। আমি জোর করে পাঠাতে সাহস পেলাম না। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কি জবাব দেব। কিন্তু ওরা থাকবেন কোথায় ? ওদের দুই ভাগ্যবতি সহকর্মি রাজী আছেন , একই কোয়ার্টারে চারজন থাকতে। এতে আমার আপত্তির কিছু নেই। ঐদিন থেকেই চারজন একসাথে থাকতে শুরু করলেন। পরদিন সকালের একমাত্র বাসে এরা দুজন কাজে গেলেন । বিকেলে নিজেদের সামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে ফিরে এলেন। এই চার জনের বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করল।

যে জিনিস আমাকে মুগ্ধ করে সেটাই আপনাকেও মুগ্ধ করবে এমন তো কোন নিয়ম নেই। ওদের দুজনের কোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসাতে ওই গ্রামে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে , সে খবর আমরা পাইনি। পরের দিন কাজে যেতেই কয়েকশ লোক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করে ফেলল।

এখানে ওই ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজের ধারাটা একটু বলা দরকার। একজন ডাক্তারবাবু সকালে মোটরবাইক চালিয়ে ওখানে যান । ঘন্টা তিনচার আউটডোরে রুগী দেখে দুপুরেই ফিরে আসেন। আমাদের ব্লক হাসপাতালের কাছেই ওনার বাড়ী। মাঝে মাঝে ব্লক হাসপাতালে একজনও ডাক্তার না থাকলে উনি এসে কোন জরুরী রুগী থাকলে দেখে দেন। ওনার চাকরীটা স্থায়ী নয় । কন্ট্রাক্ট এর চাকরী। আমি ওখানে যাওয়ার আগের থেকেই ওনার ঐ গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চাকরী। আমার থেকে বয়সেও বড়। দু একবারই দেখা হয়েছে। উনি নিজের কাজের জায়গায় কখন যান বা কদিন যান ,আমার জানা ছিল না। গন্ডগোলটা হওয়ার পর জানলাম ; উনি আগে সপ্তাহে ছদিন গেলেও , সেটা কমতে কমতে এখন সপ্তাহে দু'দিনে দাঁড়িয়েছিল। বাকী দিনগুলি ফার্মাসিষ্টই চালাতেন। ফার্মাসিষ্টই ওখানকার " ডাক্তর" , সে অনেক বছর থেকেই। আমি নিজে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র একা একাই চালিয়েছি মাসের পর মাস। সকালে একজন 'সি এইচ এস ও' আসতেন ঘন্টা তিন চার আউট ডোর করতে। জেলা আপিসে মিটিং থাকলে আমাকে যেতেই হত। তখন ঐ দাদাকে ফোনে বলে যেতাম । ওনাকে প্রায় ডাকাই হত না । আমার না থাকার সময়ে , আমাদের ফার্মাসিষ্টই হাসপাতাল সামলাতেন। আমাদের এই দুই নতুন দিদিমনি যাওয়ার পর ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিষ্ট দুজন প্রতিবেশী পেলেন । আর , ঐ অভাগা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেলিভারী রুগীদের দেখা শুরু হয়েছিল।

এই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও হয়ে গেল , এই ব্যাপারটাকে তখন অত্যন্ত জটিল এক স্থানীয় মারপ্যাঁচ মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছি , এ ছাড়া ওদের আর করার কিছু ছিল না। তো , ঐদিন দুপুরের পরে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন কর্মচারী একটি চিঠি নিয়ে এসে খবর দিল যে , ঘেরাও হয়েছে। আজ ডাক্তারবাবু যাননি, ফার্মাসিষ্টই চিঠি লিখে জানিয়েছেন। ঐ কর্মচারীকেই পাঠালাম , ওনাদের ডাক্তারবাবুর বাড়ী। ডাক্তারবাবুকে ফোনে জানালে উনি বললেন , "আমার কন্ট্রাক্টের চাকরী, আমি আর করব না। আমি আর ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোন ব্যাপারে নেই।" বুঝে গেলাম , ম্যাওটা আমাকেই সামলাতে হবে। থানার বড়বাবুকে খবর পাঠালাম। বড়বাবু আবার বিডিও সাহেবকে সব জানালেন।

বড়বাবু আমাকে বললেন , ডাক্তারই যদি না যায় তো দুটি বাচ্চা মেয়ে ওখানে থেকে কি করবে? আমি ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি, মেয়ে দুটিকে তুলে আনছি। এরপর হাসপাতালে ডাক্তার কোথা থেকে পাঠাবে সে তো মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার ব্যাপার ; আমি আপনি কি করব! বিডিও সাহেব বেশ ঠান্ডা মাথার লোক । তিনি বললেন , চলুন , আমরা তিন জনেই যাই; লোকগুলিকে বোঝাতে হবে। জনা পনের কুড়ি কন্সটেবল একটা ট্রাকে , আর আমরা বিডিও সাহেবের গাড়ীতে চললাম। গাড়িতে যেতে

যেতেই বিডিও সাহেব সমস্যাটা বুঝে গেলেন। রাত প্রায় ন'টায় পৌছে দেখি , স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্তর লোকে লোকারন্য। বিডিও সাহেব এসেছেন শুনে লোকজন বেশ আস্বস্থ হয়েছে মনে হল।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চেই বসলাম সবাই। আলোচনা যা হল প্রায় সবটাই বিডিও সাহেবের সাথে। আমাকে ডাক্তার আসার ব্যাপারে জানতে চাইলে এটুকুই বলতে পারলাম যে , ওদের ডাক্তারবাবু আর চাকরী করবেন না বলেছেন; আমি ডাক্তার আনার লোক না । ওদের ঐ জমায়েতের নেতা লোকটি দেখলাম নাটুকে। এমনিতে ওখানকার পঞ্চায়েতের বিরোধী পক্ষের লোক । নাটকীয় ভাবে একবার আমার পায়ে ধরছেন , একবার বিডিও সাহেবের পায়ে ধরছেন। যখন বুঝে গেলেন যে , এদের এখানে পিটিয়ে মারলেও , ডাক্তার আনার ক্ষমতা এদের নেই, তখন পড়লেন দিদিমনি দুজনের থাকা নিয়ে। মেয়েদের কোয়ার্টারে রাত্রে টর্চ মারা নিয়ে বলাতে প্রথমে বেশ কড়া আপত্তি জানাল। এটা ওদের গ্রামের বদনাম করা হচ্ছে। এমনকি দিদিমনিরা চলে যাওয়ার জন্য মিথ্যা বলছে , এমনও বলতে থাকল। দিদিমনিদের কোয়ার্টারের সব থেকে কাছে থাকেন একজন মাষ্টার মশাই। তিনি বললেন, ডাকলেই আমি চলে আসতাম।

নেতা ছেলেটি যে কথা বার্তায় বেশ চালাক চতুর সেটা ওর একটা " উকিলের যুক্তি" শুনলেই বুঝবেন । শেষ পর্যন্ত যখন দিদিমনিদের কোয়ার্টারে থাকা নিয়েই ঝোলাঝুলি শুরু হল, তখন ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে জানতে চাইলাম। উত্তরে নেতা ছেলেটি বলল, কারও নিরাপত্তার দায়িত্ব কি কেউ নিতে পারে? " ইন্দিরা গান্ধীর কি নিরাপত্তা কম ছিল ? তাঁকেও তো গুলি খেয়ে মরতে হল"। শেষ পর্যন্ত ঐ মাষ্টার মশাই এর ভরসায় দিদিমনিদের দুজনকে ওখানের কোয়ার্টারে থাকতে হবে, সাব্যস্ত হল। রাত বারোটার পরে যখন দিদিমনি দুজন বিডিও সাহেবের গাড়ীতে ওই রাতের মত ফেরার অনুমতি পেলেন , তখন আর তাঁদের কাঁদারও শক্তি ছিল না। পরদিন আবার ওদের বাক্স বিছানা নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হল।

গাড়িতে ফেরার সময় বড়বাবু বিডিও সাহেবকে বলছিলেন, ওনার ঐ তিন ঘন্টা নাটক শোনার ইচ্ছা ছিল না ; এক সময় ভেবেছিলেন, ঐ নেতাকে পিটিয়ে গাড়িতে তুলে আনবেন। অবশ্যই সেটা ভালো কাজ হত না। পরে কিন্তু ঐ নেতা বা ঐ গ্রামের লোকগুলির কাজকে আমার প্রসংশনীয়ই মনে হয়েছে। নিজেদের গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থা নিয়ে ওরা সেদিন যা করেছিল , ঠিকই করেছিল। আমার নিজের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র আজ বছর পনের হল ভুতের বাড়ী হয়ে পড়ে আছে। আমার গ্রামের লোকগুলির উদ্দমের অভাবই এর জন্য দায়ী। একটা কথা আমি প্রায়ই বলি, "বাচ্চা না কাঁদলে মাও দুধ দেয় না।" আমি চাষবাস , ব্যবসা নিয়ে মেতে থাকবো আর আমার গ্রামের সমস্যা শহর থেকে লোক গিয়ে মিটিয়ে আসবে , এটা না ভাবাই ভালো।

সিজগেড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর আবাস, ২০০৫ সালে

বাইশ তেইশ বছর পর লিখতে গিয়ে এখন দেখছি সেই দুই দিদিমনির নামও ভুলে গেছি। সেই স্মার্ট দিদিমনি এখনও যোগাযোগ রাখেন, তাই তার মেয়েই এখন সেই দুই দিদিমনির মত বড় হয়ে গেছে দেখেছি। ওদের দুজনেরও মেয়েরা হয়তো এখন নার্শিং ট্রেনিং নিচ্ছে। ওদের মায়েরা নিশ্চয়ই ছেলে মেয়ের কাছে গল্প করে সেই সব দুর্দিনের কথা বলেছেন। জানা হয়নি , ওদের তখনকার নিধিরাম সর্দার, বি এম ও এইচ স্যারের সম্বন্ধে ওরা কি ভেবেছিলেন তখন । আর এখনও বা কি ভাবছেন ? এতোগুলি লোকের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা উপরওয়ালা আর কোন দপ্তরে আছে কিনা জানিনা। আজ আমার কন্যা একটা দপ্তরে ঐ রকমের কিছুটা দায়িত্বের পদে যোগ দিয়েছে। প্রথম মাস দেড়েক প্রশিক্ষন চলবে। কি শিখছে জানতে গিয়ে ওর কাছে যা জানছি, তাতে নিজের সে সময়কার অসহায়তার কথাই মনে পড়ছে। এদের সিনিয়ররা কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, কোথায় কি কি সমস্যায় পড়তে পারে, কি করে সামলাবে , এসবই শেখাচ্ছেন। আজকের নিধিরাম সর্দাররা অন্তত কাজে যোগ দিয়ে ,কি করতে হবে সেটুকু শিখে কাজে নামবে, এটা আশা রাখছি। তাতে নতুন আমলার বিড়ম্বনা যেমন কমবে , দপ্তরের কাজও অনেক ভালো ভাবে চলবে।

পুনশ্চ: ১২.১২.২০২৪.

মারনাই ইটাহার নিয়ে যে সকল কথা লিখলাম, ওগুলি পঁচিশ বছর আগের কথা। আজকের খবর, সেই মারনাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দু'জন ডাক্তারবাবুর মধ্যে একজন, আর চারজন নার্স দিদিমনি এখন মারনাইতে থাকেন। ইটাহার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাঁচজন ডাক্তারের মধ্যে তিনজন এখন ইটাহারের কোয়ার্টারে থাকেন। আমি বছর দুই আগে একবার ওদিকে কাজে গিয়ে, ঘন্টা দেড়েকের জন্য ইটাহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার এক্কার সাথে দেখা করে গল্প করে এসেছি। অনেক নতুন বাড়ী ঘর হয়েছে। ডাক্তারদের নতুন কোয়ার্টার হয়েছে। বর্তমানে ঐ জেলার CMOH ডা শর্মা আমার অনেকদিনের পরিচিত। কাজের মানুষ বলে সুনাম আছে। আমি তিরিশ বছর আগে যখন ঐ জেলায় প্রথম সরকারী চাকরী করতে যাই তখন যিনি CMOH ছিলেন, তিনি বেশ মজার কায়দায় ঝামেলার কাজ

এড়িয়ে যেতেন। উনি বছর দশেক আগে প্রয়াত হয়েছেন। ওনাকে নিয়েই একদিন লেখার ইচ্ছা আছে।

বেচারাম ডিম বেচে , কেনারাম কেনে

" বেচারাম ডিম বেচে , কেনারাম কেনে। সেই ডিম রাখে কেনা , হাঁড়ি ভরে এনে। "

ছোটবেলায় " হাসি খুশি" বইতে পড়েছিলাম। প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরেও সুন্দর মনে আছে। আমার এক বৃদ্ধ বন্ধু, অধুনা প্রয়াত, চন্দবাবুর কথা আর এক জায়গায় লিখেছি। বছর তিরিশ আগে, মেদিনীপুর শহরে থাকার সময়, এই চন্দবাবুর সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার থেকে বয়সে বছর তিরিশ –এর বড় , স্পষ্ট বক্তা মানুষটি আমার খুব প্রিয়জন ছিলেন। মাঝে মাঝেই বেশ অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতেন। আমি বছর বত্রিশ –তেত্রিশ বয়সে , মেদিনীপুর শহরে একটা পুরনো বাড়ী কেনা যায় কিনা ভাবছিলাম। ওখানকার রবীন্দ্র নগর ছিল ডাক্তার পাড়া। শহরের অন্য যে কোন পাড়ার থেকে এই রবীন্দ্র নগরে জায়গা জমির দাম অনেকটাই বেশি ছিল। তার থেকে বড় কথা, ফাঁকা জমি প্রায় ছিলই না। পুরনো বাড়ী এক দুটি যা বিক্রী হত , দাম ছিল অন্য কোনো পড়ার প্রায় দ্বিগুণ। আমি একটা পুরনো বাড়ীর খবর পেয়ে দেখতে গেলাম। বাড়ীর কোন ছিরি ছাদ নেই, দামও আমার ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। এসব কথা শুনে , চন্দবাবু বলেছিলেন," আপনার বয়স কত? এখনই কেন বাড়ী কেনার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?" বললাম, এ পাড়ার যা অবস্থা, দু' তিন বছর পর আর কেনার মত বাড়ী বা জায়গা থাকবে না। উনি সাথে সাথেই বললেন, " আরে না, কেনারাম বেচারাম চলতেই থাকবে"! আমার জীবনে এমন বাস্তব সত্য কথা আর খুব একটা শুনিনি। একেবারে সত্য দ্রষ্টা মুনি ঋষিদের মত কথা। সেদিন আরও কিছু কথা উনি আমাকে বলেছিলেন। চন্দবাবু বলেছিলেন, "অপনার এমন কিছু বয়স হয়নি যে এখনই একটা বাড়ী কিনে নিয়ে বসে যেতে হবে। শেষে সেই বাড়ীই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বয়স হোক, তখন যেখানে ইচ্ছা করবে, বাড়ী করে থাকবেন। "

চন্দবাবু বেঁচে থাকতে জেনে গেছলেন, আমি ব্যারাকপুরে ফ্ল্যাট কিনেছি। আমার বর্তমান ঠিকানা, দমদম জংশন স্টেশন –এর পাশে; এটা চন্দবাবুর জেনে যাওয়া হয় নি। তার আগেই উনি মরে শান্তি পেয়েছেন। আমার আগের লেখায় লিখেছি; একজন প্রিয় মানুষের মৃত্যু সংবাদ আমাকে গভীর প্রশান্তি দিয়েছিল। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। চন্দবাবু সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে দেখে গেছেন, সেই রবীন্দ্র নগরেই, আমাকে সেই প্রায় বেদ বাক্য বলার দশ বছর পর, আমার এক বন্ধু বাড়ী কিনেছে। চন্দ বাবুর বাড়ীর কাছেই। আমি জানি, বোধহয় আজ আমার বয়সটা চন্দবাবুর সেদিনের বয়সের মত হয়েছে বলেই, আমি আজই খুঁজলে, রবীন্দ্রনগরেই দু- একটা বাড়ী পেয়েও যাব।

মেদিনীপুর জেলা আমার জন্ম স্থান; বেশ গর্বের সাথেই কথাটা সব সময় বলি। কিন্তু মেদিনীপুর শহরে বছর সাতেক থাকার পর , আরও কয়েকটা জেলায় কয়েক বছর করে থেকেছি। মূলত সরকারী চাকরী করার জন্য জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন এটুকু বলতে পারি, পেশার কারনে থেকে যেতে না হলে, মেদিনীপুর শহরে আজীবন আটকে থাকার মত কোন আহামরি জায়গা ওটা নয়। ঐ যে চন্দবাবু বলেছিলেন, সেই বাড়ীই একসময় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, কথাটা কী সাংঘাতিক ভাবে সত্যি , আমার চোখের সামনে প্রতিদিন দেখছি।

এক, দুই ,চার, ছয় করে গোটা দশেক উদাহরণ আছে, আমার আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মীদের মধ্যেই। অবশ্য শুধু স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে , একজন মানুষ চারটি শহরে চারটি বাড়ী বা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে, এমন উদাহরণও কম নেই। আমি আমার নিজের কথাই বলি। মেদিনীপুর শহরে পুরনো বাড়ী আর জায়গার খোঁজ খবর করতে

করতেই চলে গেলাম, উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী করতে। বছর চারেক ওদিকে থাকার পর , আবার একটা বাড়ী কেনার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক সংকট দেখা দিল যে, উত্তর বঙ্গের থেকে একেবারে উত্তর ২৪ পরগনায় চলে আসতে হল।

আজও মেদিনীপুর শহরে গিয়ে চারজন লোকের সাথে কথা বলে দেখুন; তিনজনই বলবে, মেদিনীপুরে 'ডাক্তারী ব্যবসা' এত ভালো চলে যে, এখানে এলে ডাক্তাররা আর যায় না। আমি এ রাজ্যের সবকটা জেলা শহর ঘুরেছি। প্রতিটা জেলা শহরে ডজন ডজন ডাক্তারের সাথে কথা বলে দেখেছি; সব জেলা শহরেই অন্য জেলা থেকে আসা অনেক ডাক্তার ঘর বাড়ি করে থেকে গেছেন। কলকাতায় বাড়ী,উত্তরবঙ্গের জেলা শহরে বাড়ী কিনে থেকে গিয়েছেন, এমন ডাক্তারের অভাব নেই। আমাদের মেদিনীপুরের ছেলে, রায়গঞ্জ শহরেই থেকে গেল।

ব্যারাকপুরে চাকরী করতে এলাম একটা ব্যতিক্রমী জরুরী পরিস্থিতিতে। জানতাম , খুব বেশীদিন ওখানে কাজ করতে হবে না। কিন্তু ছেলে মেয়ে দুজনকেই ব্যারাকপুরের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হল। যখন প্রায় ব্যারাকপুর ছেড়ে অন্য হাসপাতালে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল, আমার কলেজের এক দাদা আমাকে পেড়ে ফেলল। ওরা ব্যারাকপুরে একটা ফ্ল্যাট কিনছে, ঐ বাড়িতেই দু' একটা ফ্ল্যাট এখনও বিক্রী হয়নি; আমি একটা কিনি, এমনটা ঐ দাদার ইচ্ছা। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' , এই প্রবাদ বাক্যটা নিজের ক্ষেত্রে ফলতে কজন দেখেছে? আমার অবস্থা তখন তার থেকেও খারাপ। আমার পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের খবর, ঐ দাদা সব জানেন। দাদা নিজেও আমার ছেলের জন্য রক্ত দিয়েছেন। তবুও একটা লাখ পাঁচেক টাকার ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাঙ্কের লোন পাওয়া যায়, এবং ইত্যাদি হিসেব করে দেখালেন। ওনার চাপাচাপিতে গেলাম প্রোমোটার -এর বাড়ী। সবথেকে ছোট যে ফ্ল্যাটটি তখনও খালি ছিল , সেটাই কেনা যেতে পারে , বুঝলাম। আজও ভাবলে অবাক লাগে, কি করে তখন ঐ দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম। মনে আছে, ঐ সময় এক দালাল, ঐ পাড়ার আরও ভেতরে একটা পুরনো ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যায়। সে যা দর বলেছিল তাতে পরের পাঁচ বছরেও একটা ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবতে পারিনি। সে দালাল বলেছিল, "ব্যারাকপুর গাঁজা গলিতে ফ্ল্যাটের দাম বালিগঞ্জের মত।" পরে বুঝেছিলাম, দালালরা ওভাবেই বলে।

সেই গোয়েন্দা গল্পের মত , "কোথা হইতে কি হইয়া গেল, আক্রমণকারির হাত হইতে আগ্নেয়াস্ত্র গোয়েন্দার হাতে আসিয়া গেল!" হাতে একটি টাকা না থাকলেও , ঐ ছোট ফ্ল্যাটটি কেনা হল। এক্ষেত্রে কেনারামের জয় হইল। কিন্তু বেচারাম যদি প্রোমোটার হয়, একটি টাকাও ছাড় পাওয়ার আশায় না থাকাই ভালো। ব্যাংকের মূল্য নির্ধারক ভদ্র লোকের একটি কথাও ,আজ বছর কুড়ি পরেও ,ভীষন আধুনিক মনে হচ্ছে। উনি বলেছিলেন, " প্রোমোটারের সাথে পাঁচ লাখে কথা হয়েছে? তাহলে ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে আরও এক লাখ আপনার খরচ হবেই!" বাস্তবে আমি ঐ ছোট

ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় পর্যন্ত ,রেজিস্ট্রির খরচ নিয়ে সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। এই সাত লাখ টাকা কিন্তু দু'হাজার তিন সালের খবর। দশ বছরে ঐ সাত লাখের বাজারদর হয়ে গেল বাইশ লাখ। এবার আমি বেচারাম।

এই দশ বছরে আমার ছেলে মেয়ে দুজনেই কলেজে পড়তে শুরু করেছে, কলকাতায়। আমি তো এই এই ফ্ল্যাটে ঢোকার আগেই হাবড়া হাসপাতালে চলে গিয়েছি। সব থেকে বড় কথা, আগেই বলেছি,সবথেকে ছোট ফ্ল্যাটটি কিনতে পেরেছিলাম। এদিকে ব্যাংকের লোনও শেষ করতে পেরেছি। ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটে সুখে শান্তিতে দিন কেটে যাচ্ছিল। একটাই সমস্যা; গ্রীষ্মের মাস দুই- তিন গরমে বেশ কষ্ট। আশপাশের প্রায় সব বাড়িতেই 'এ সি' লেগে গেল; এবার আমার ফ্ল্যাটেও 'এ সি' না লাগালেই নয়। এক সকালে ছেলেকে নিয়ে খবরের কাগজে কেনারাম বেচারাম -এর পাতাটা দেখতে বসলাম। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ায় কয়েক ডজন ফ্ল্যাট বিক্রী আছে। গোটা চারেক -এর ঠিকানা দেখে ফোন করে আরও কিছু তথ্য জেনে নেওয়া গেল। ওগুলি দেখতে গিয়ে, বিশেষ করে দালালদের বদান্যতায় আরও তিনগুণ ফ্ল্যাট এমনকি নতুন তৈরী বাড়ীরও সন্ধান পেলাম। সপ্তাহে তিন- চারটি ফ্ল্যাট ইত্যাদি দেখতে যেতাম। দশ বছর আগে , চার লাখ টাকা লোন পাওয়া যাবে কি না তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল; এবার ব্যাংকের ম্যানেজার তিরিশ- চল্লিশ লাখ টাকা দিতে পারেন জানালেন। ধার নিলেই তো হবে না, শোধ করতে হবে। আমার ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাখ পনের পেতে পারি,এমন ভেবেই নিজের ক্রয় ক্ষমতা ঠিক করে নিলাম। ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটের এক প্রতিবেশীও তার একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চেষ্টা করছেন, খোঁজ পেয়ে তার সাথে একদিন দেখা করলাম। উনি ঝানু বেচারাম। বললেন, অপনার ফ্ল্যাট পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে দাম পাবেন। আমার হিসেবের পনেরলাখটা কুড়িতে পৌঁছতে পারে , এটা বুঝলাম। সেই মত একটা বাজেট করে এগোতে শুরু করলাম। অন্তত দুটি পুরনো ফ্ল্যাটের কাগজ পত্র নিয়ে উকিল বাবুকে দেখতেও দিলাম। এক বৃদ্ধের ফ্ল্যাট কেনার জন্য কয়েক লাখ টাকা দিয়ে চুক্তি পত্র তৈরী করার জন্য টাকা জোগাড় করলাম। আগের দিন রাতে তার কন্যা ফোন করে জানালেন, "এখন দিতে পারছি না। বাবা ঐ ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমার পাশে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে চলে আসার কথা ছিল; কিন্তু এর মধ্যে এটা বিক্রী হয়ে গেল। " আবার অন্য কোনোটা নেওয়া যায় ভাবতে শুরু করলাম। এক মার্কামারা দালাল প্রতিষ্ঠান মারফত আর একটা বেশ পছন্দের পুরনো ফ্ল্যাট কেনার জন্য এগোলাম। এটাতে কেণারাম বেচারাম এর খেলা বেশ উপভোগ্য ছিল।

কেষ্টপুরের এই দোতলার তিন রুমের ফ্ল্যাটটি আমাদের খুব পছন্দ হল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে লোকজন ভদ্র মনে হল। কিন্তু দালালের এক কর্মচারী নিচের যে গ্যারেজ দেখিয়েছিল, সেটি আদৌ ঐ ফ্ল্যাটের সাথে বিক্রী হচ্ছে না জানলাম। দালালকে ফোন করলে বলল, ওটা কয়েক মাস পর বিক্রী হবে। প্রথমেই কথার খেলাপ হল, কেনারাম বিগড়ে গেল। জানলাম ফ্ল্যাটের মালিকের ওষুধের ব্যবসা ঐ নিচের গ্যারেজে। ব্যবসার জন্য অনেক টাকা

দরকার তাই ব্যবসায়ী ভাইপোকে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাইপো ভিন রাজ্যে থাকে, পাকা বেচারাম। দালালের কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর নিয়ে , আমাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করে, তার চালিয়াতি যুক্তি চালিয়ে গেল। আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, একটি কথা আমি প্রায়ই বলি; "একজন এম বি বি এস পাশ ডাক্তারকে যে বোকা ভাবে, সেই হদ্দ বোকা"! আমরা ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময়ই মুখের উপর কথাটা বলিনা। কিন্তু সামনের গাধাটা আমাকে বোকা ভাবছে, এটা বোঝার মত বুদ্ধি না থাকলে, কেউ জয়েন্টে Rank করে ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পাবে না।

গেল ঐ কেষ্টপুরের ফ্ল্যাট। এমনকি ঐ বাড়ীর সেক্রেটারী ভদ্রলোক পরে আমাকে ফোন করে জানালেন যে, ঐ বাড়িতেই আর একজনের গ্যারাজ বিক্রী আছে, আমি ওটা আলাদা করে কিনে নিতে পারি। কিন্তু ঐ যে বেচারামকে চালিয়াত মনে হল, আর ওদিকে গেলাম না। এর পর দমদমের বর্তমান ফ্ল্যাটের একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। গিয়ে দেখি, আমি যেটা নিতে পারি ,মানে একেবারে প্রথম পছন্দের না হলেও , দ্বিতীয় বা তৃতীয় পছন্দের অবস্থান, দক্ষিণ খোলা, কিছুটা ওপরে, সেই ফ্ল্যাটের ছাদ সবে ঢালাই হয়েছে। প্রোমোটার জানালেন, ঠিক এক বছরের মধ্যে ঢুকে পড়ার মত করে দেবেন। আমারও ব্যাংকের লোন, ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি এসব করতে এক বছরের বেশিই লাগবে, ওদের জানালাম। এটা বুক করেই,ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চাই, লোকজনকে বলতে শুরু করলাম।

সে সময় একটা কথা বন্ধুরা খুব বলত। "মানুষ কিনতে পাগল, বিকতে ছাগল"! ঠিকই ,আগেও গোটা দুই তিন পুরনো ফ্ল্যাট কিনতে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভাল, ওসব ক্ষেত্রে বেচারামরাই বিগড়ে যায়। এবার এই নতুন ফ্ল্যাট কেনার জন্য পাগলের মত ব্যস্ত না হলেও, আমার ক্রয় ক্ষমতার অনেক বেশি দামেই কিনব ঠিক করে নিলাম। জানতাম,ব্যাঙ্ক এবার অনেক বেশি লোন দেবে।

ওদিকে মুখে মুখে শুনেই , ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট কেনার লোক আসতে শুরু করেছে। একজন ভদ্রলোক তো পারলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কেনেন। ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ভদ্রলোক ;পঁচিশ লাখ টাকা দাম দিতে তৈরী। কিন্তু আমার পুরনো প্রতিবেশীদের কেউ কেউ এমন অশ্লীল ভাবে আপত্তি জানালেন যে, উনি আমার সাথে এসে দেখা করতেই পারলেন না। আমি জানি বেচারাম কেনারমের গল্পে , এই " আপত্তি" ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু ব্যাপারটা এতোই, "পলিটিক্যালি ইনক্যারেক্ট" যে, আমি লিখতে পারছি না। কারো জানার আগ্রহ থাকলে আমার কাছে ব্যক্তিগভাবে জেনে নিতে পারেন।

এবার আমি হলাম বেচারাম। চন্দবাবুর সেই অমোঘ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বেচারাম থাকলে কেনারামও থাকে। দিন সাতের মধ্যে আমার এক ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার এসে বলল, অপনার ফ্ল্যাট আমাকে দিতেই হবে। আমি পঁচিশ লাখ দাম পেয়েছি জানালাম। ও বলল,ওর একটা ফ্ল্যাট অন্য জায়গায় আছে, সেটা বিক্রী করে আমারটা কিনবে, একটু দাম কমাতে হবে। ঠিক আছে, আমি তো কুড়ি লাখ পাবো ধরে এগোচ্ছিলাম; ওকে চব্বিশ বললাম। ও দু' লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করল। আমিও বেচারাম হয়ে যা পাচ্ছি, বাকিটা হিসেব করে ব্যাংকে লোনের জন্য দরখাস্ত জমা দিলাম। আমার প্রোমোটার বেশ ভালো ভাবেই কাজ এগোচ্ছে দেখলাম। নিজের জমা আর অন্যান্য দিক থেকে টাকা তুলে প্রোমোটারের কিস্তি দিতে থাকলাম। কিন্তু সমস্যা দু' দিকেই দেখা গেল।

একদিকে প্রোমোটার একটা জরুরী কাগজ দিতে না পারায় , ব্যাংকের লোন আটকে আছে। প্রোমোটার বলছেন, সরকারী আপিসে সব টাকা পয়সা জমা করা হয়েছে, কিন্তু অপিসের ঢিলেমিতে কাগজটা পেতে দেরী হচ্ছে। ওদিকে আমার ভাইটিও যে কোন কারনে হোক তার ফ্ল্যাটটি বিক্রী করতে পারছে না। অর্থাৎ কেনারম আর বেচারাম দু'জনেই ঝুলে আছে। এভাবে একবছর প্রায় পেরিয়ে গেছে। আমার ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট কেনার জন্য আরও কেনারামের খবর পাচ্ছি। কেউ কেউ বলছে, ওটা এখন তিরিশ লাখ পাবেন। ভাইটিকে বলতেই হল যে আর সময় দেওয়া যাবে না। ভাইটি প্রায় কেঁদে জানাল, পারিবারিক সমস্যার কারণে বিক্রী করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের লোন নিয়ে আমার নতুন ফ্ল্যাটটি কেনা হল। এক বছরের জায়গায় চোদ্দ মাসেই , প্রোমোটার আমাকে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে দিলেন। ওদিকে ভাইটি যে সত্যিই বেকায়দায় পড়েছে জানতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত বাইশ লাখেই ওকে ফ্ল্যাটটি দিয়ে দিলাম। সাত লাখের কেনারাম, দশ বছরে, বাইশ লাখের বেচারাম হয়ে গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই জানলাম, আমাদের ব্যারাকপুরের সেই বাড়ীর চব্বিশটি ফ্ল্যাটের মধ্যে আরও গোটা তিনেক বিক্রী করে, পুরনো বাসিন্দারা চলে গেছে। তারা কে কি কারণে বিক্রী করেছে আমার জানা নেই। আমি তো কলকাতার আরও কাছে আসতে চেয়েছিলাম। তার থেকে বড় কথা, ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায় একটু বড় ফ্ল্যাটের দরকার হয়েছিল। আমার সেই ভাই আবার, বছর চার- পাঁচ থেকে, সেই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছে।

ওদিকে আমার সেই দাদাও, আমি আসার পর পরই অন্য জেলায় বদলী হয়ে গেছেন। মেয়ে কোলকাতার একটা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ায় ওনারা ওর কলেজের কাছে একটি ফ্ল্যাট কিনে নেন। মায়ের চাকরী ব্যারাকপুরে থাকলেও, মেয়ের জন্যই মা মেয়ে কলকাতায় থাকতে শুরু করে। ওদের ছেলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিন রাজ্যে চলে

গেল। মেয়েও উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ায় পর, ওদের মাও ট্রান্সফার নিয়ে স্বামীর কাছে চলে গেছে। অর্থাৎ , আপাতত দুটি ফ্ল্যাট তালা বন্ধ হয়ে থাকে। ওনারা অবশ্য , চন্দবাবুর কথা মত, এই ফ্ল্যাট বা বাড়ী গুলিকে, "বোঝা" ভাবেন কি না আমি জানিনা। আমার পরিচিত ডজন খানেক মানুষ আছেন, যারা বিদেশে বা ভিন রাজ্যে চাকরী করার জন্য গিয়ে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছেন। তাদের কারো বৃদ্ধা মা একা একা একটা বাড়ী আগলে পড়ে আছেন। কারো বা তাও নেই। আমি ব্যারাকপুরে এসে প্রথম যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, সেই বাড়ীর আসল মালিক মহিলাকে আমরা এসে দেখনি। আমরা আসার আগেই তিনি গত হয়েছেন। তাঁর মেয়ে জামাই দু'জনেই দূরের জেলায় ভালো চাকরী করেন। আমার আগে যে ভদ্রলোক ভাড়ায় ছিলেন, তিনিই বছর দশেক বাড়িটি দেখভাল করেছেন। পরে আমি যে বছর তিনেক ছিলাম, সেই বাড়িওলা জামাইবাবু বোধহয় তিনবার এসেছিলেন। আর আসল বর্তমান মালিক, দিদি এসেছিলেন মাত্র এক বারই। আমি চলে আসার পর কে এসেছে, আর জানা হয়নি।

আমার ভাগ্য ভাল, যে দুটি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি, প্রোমোটার দাম একটু বেশি নিলেও ঠিক সময়েই ফ্ল্যাট তৈরী করে দিয়েছে। আমার নিকট আত্মীয় ফ্ল্যাট কিনে ঢোকার দু'দিন পরে হাতে উকিলের চিঠি পেয়ে জানতে পারে, ঐটি ছাড়াও আরো কয়েকটি ফ্ল্যাট, প্রোমোটার একজনের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে রেখেছে। পলতা রেল স্টেশন-এর পাশে, কয়েকশ ফ্ল্যাটের একটা প্রায় নতুন শহর তৈরী হচ্ছিল, বছর দশ বার আগে। বিরাট কোম্পানির প্রকল্প। এই বেচারাম এর কাছে লাখ লাখ টাকা বায়না দিয়ে যারা ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দুর্ভাগ্য দেখলে আমার কষ্ট হয়। তিন চার তলা পর্যন্ত খাঁচা তৈরী হয়েছে। তারপরই কাজ বন্ধ। দশ বছরে সেই সব সিমেন্টের খাঁচায় কত মোটা ধুলোর আস্তরণ জমেছে জানিনা। কেনারাম বেচারাম-এর ছড়াটা আজও মনে আছে বলেছিলাম। শেষ লাইন দুটি হল; "একদিন ডিম ফুটে, বের হল বিদঘুটে, কালো কালো কদাকার দাঁড়কাক গুলো। কেনা বলে বেচারাম চোখে দিল ধুলো।"

পুনশ্চঃ চাকরী থেকে অবসর নিয়ে , আবার আমি কেনারাম। এবার গন্তব্য " গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারানসী সমতুল।" কোথায় ? ডিম ফুটুক আগে; তারপর জানাব , কাক না, কোকিল কি বেরল!

হাউসিং এর নিজস্ব গঙ্গার ঘাট

মিত্রা মাসি

মহালয়া এলে বাঙালির কিছু স্মৃতিমেদুরতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। আমার মত বরিষ্ঠ নাগরিকদের তো আচ্ছন্ন করে রাখে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মশাই এর সেই অলৌকিক স্তোত্র পাঠ। আমাদের তো জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই আকাশবাণীর প্রভাতী এই অনুষ্ঠান আমাদের স্মৃতির মর্ম মূলে ঢুকে গেছে। গত ৬০-৬৫ বছরে গোটা পৃথিবীর সব কিছুই প্রায় ওলট পালট হয়ে গেল; কিন্তু আমাদের মন থেকে মহালয়া একটি বছরের জন্যও সরে গেলো না। এই মহালয়ার ভোরের কত মধুর মায়াময় স্মৃতি। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে থাকার সময় অন্তত দু বার এই মহালয়ার ভোরে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা যেন এই সেদিন ঘটেছিল।

তখন আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্র। আগের রাত্রে মেসে খেতে গিয়ে কানাঘুষো শুনলাম, কাল মহালয়ার ভোরে কোথায় যেন যাচ্ছে কয়েকজন। মনোজিৎদাকে ধরে জানলাম, বি ডি আর ট্রেনে চেপে কোথাও যাওয়া হবে। আমিও যাব। বেশী লোককে জানানো হয়নি; তবুও ভোর রাত্রে উঠে স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল চোদ্দ জন। কি এই বি ডি আর? বাঁকুড়ার আজকের প্রজন্মের প্রায় কেউ জানেই না। বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে নামে একটা ন্যারো গেজের, কয়লার ইঞ্জিন এর রেল গাড়ি চলত তখন। পরে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ওটা। আবার নতুন করে ব্রড গেজ লাইন হয়েছে কয়েক বছর হল। দিন দুই আগে ঐ লাইনে সরাসরি বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া ট্রেন চালু হয়েছে। আমরা শুধু ঐ প্রায় খেলনা গাড়ীতে চাপার আনন্দে রাত থাকতে ছুটেছি। দুটি স্টেশন গিয়ে বেলিয়াতোড়ে নামলাম। ওখান থেকে বাস ধরে দু তিন কিমি দূরে ধবনীতে নামলাম। ধবনীতে আমাদের ক্লাসের কেশবের গ্রামের বাড়ি। সকলে হৈ হৈ করে ওদের বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই। চোদ্দ জন কেন, চারজনও না জানিয়ে কারো বাড়ীতে ঢুকতে পারব না। বাড়ীতে কেশব ছিল না, ছিলেন ওর কাকা। কেশব বোধহয় সেদিন ধানবাদে ছিল। ওর কাকু আমাদের সাদরে ডেকে নিলেন। আমরা ভেবেছিলাম চা খেয়ে চলে আসব; কাকু কিন্তু আমাদের দুপুরে না খেয়ে আসতে দিলেন না। উনি বাস ধরে বাঁকুড়া চলে গেলেন। বাঁকুড়া থেকে মাছ কিনে ফিরলেন। আমরা চা মুড়ি খেয়ে মাঠের দিকে ঘুরতে গেলাম। মাঠের পাশে পলাশ গাছের ছায়ায় বসে গল্পগুজব করলাম। দুপুরে খেয়ে হোষ্টেল এ ফিরলাম।

আর একবার মহালয়ার ভোরে দল বেঁধে চললাম নদী দেখতে। হাসপাতাল এর পশ্চিমে তখন শুধুই ধানের ক্ষেত। এক মাইল মত দূরে দ্বারকেশ্বর নদী। আমরা রাত থাকতে চললাম মাঠের আল ধরে। আমাদের পরের ব্যাচের ঘোষাল এর হাতে ঝোলানো একটা প্রমাণ সাইজের রেডিও। রেডিওতে বাজছে মহালয়া। আমরা মিছিল করে যখন নদীর পাড়ে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার। বর্ষার পর বলে নদীতে একটু জল ছিল। অন্ধকার ছিল বলেই আমি জামা প্যান্ট খুলে নদীতে নেমে একটা ডুব দিয়ে এলাম। ঘোষাল এর সেই ঢাউস সাইজের রেডিও কিন্তু তার আগের প্রজন্মের রেডিওগুলির প্রায় অর্ধেক ছিল। সেই রকম বিরাট একটা রেডিও ছিল, আমাদের মিত্রা মাসীর।

মিত্রা মাসি ছিলেন আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন স্বাস্থ্যকর্মি। মিত্রা মাসি, বেলাদি, নিতাইদা, টিকাদাদু, কম্পাউন্ডার বাবু , সুধার মা সবাই আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী। ওনারা সবাই কোয়ার্টারে থাকতেন। বন্যা হলে আমরা বাক্স প্যাটরা নিয়ে ওদের কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। অবশ্য ডাক্তারবাবু ছাড়া সবারই একটি করে ঘরের ছোট ছোট কোয়ার্টার। এই মিত্রা মাসি আমার মাকে দিদি আর বাবাকে জামাইবাবু বলতেন সবদিন। পরে

জেনেছি , আমাদের বোধ হওয়ার আগেই কোন এক কালী ডাক্তার মাসিকে বিয়ে করার নামে প্রতারণা করেছিলেন। সেই সময় বাবা মাসির পাশে দাঁড়িয়ে প্রচুর লড়াই করেছিলেন, বিচারের আশায়। আমরা কোনদিন মাসিকে শাঁখা সিঁদুর পরতে দেখিনি। চাকরী করতে করতেই পঞ্চাশের উপর বয়সে মাসি একদিন হঠাৎ মারা গেছেন। এই মাসির কোয়ার্টারে আমার আর ছোট ভাইয়ের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ থাকত। আমরা সকাল থেকে গিয়ে মাসির কোয়ার্টারে বসে থাকতাম। মাসি কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে ডিমের ঝোল ভাত রান্না করতেন। সেই রান্নার লোভনীয় গন্ধ এখনও চোখ বন্ধ করে মনে করতে পারি। এখন অবশ্য " ডিস্ভাত" বলে একটা রাজনৈতিক পরিভাষা খুব বিখ্যাত হয়েছে। সেই তিন-চার বছর বয়সে মাসির কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ আমাদের কাছে একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। সেই প্রায় প্রাচীন যুগে, দুই একবার মিত্রা মাসীর সেই ঢাউস রেডিও, মহালয়ার ভোরে আমাদের বাড়িতে বেজেছিল। আগের রাত্রে বড়দা ওটা ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিল। সবাই ভোরে উঠে মহালয়া শোনা শুরু করতাম। কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত মাঝপথে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, সবটা শোনা হয়নি। আমার অতি শৈশবের সামান্য যে কয়েকটা স্মৃতি এখনও আছে তার অন্যতম সেই মিত্রা মাসীর বড় রেডিওতে মহালয়া শোনা। পরে আমাদের বাড়ীতে রেডিও এসেছে। আমি ডাক্তার হয়ে নিজে একটা রেডিও কিনেছি। বছর দশেক হল রেডিও খারাপ হয়ে বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় কম্পিউটার এ মহালয়া বেজেছে। এবার তো মোবাইলে , অনলাইনে সরাসরি আকাশবাণীর মহালয়া শোনা গেল। কিন্তু মহালয়া এলেই আমার মনে আসে মিত্রা মাসির সেই বিরাট কাঠের বাক্সের মত রেডিওটা। ৩.১০.২৪.

একটা পাথর

একটা পাথর কেমন করে দেবতা হয় , দেখিয়েছেন সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী মশাই। আমাদের প্রায় সব দেবতা আর মন্দির তো পাথরেরই তৈরী।

আদিম যুগে পাথরই মানুষের জীবন ধারনের হাতিয়ার ছিল। আবার এই পারমাণবিক অস্ত্রের যুগেও , হাজার হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল পাথর, ছুড়ে মারার জন্য। এই পাথরের আর এক রূপ দেখা যায় মানুষের হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুলে। নানা রঙের সেসব পাথরের কাজ মারা নয়, বাঁচানো। একদল বলে , এই সব রঙিন পাথর নাকি মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচায়। আর একদল বলে , এই সব রঙীন পাথর পুরোটাই বুজরুকি।

পাথরের কত রূপই না দেখলাম। ভুগোলের বইতে পাথর নিয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা আছে। আমাদের মত আদার ব্যাপারীর অত শত নিয়ে ভাবার সময় কোথায়। বিজ্ঞানীদের মতে পাথর নিয়ে অনেক জ্ঞানের কথা আছে। আমি সাধারন মানুষ, ওসবের দিকে যেতে চাই না। পাথর নিয়ে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

গলব্লাডার আর কিডনির পাথর আজকাল সবার জানা। আচ্ছা বলুন তো , গলব্লাডারে পাথর কি করে হয়?

ডাক্তারী বইতে এ নিয়ে সুন্দর একটা কথা আছে। এই গলষ্টোন হল মৃত ব্যাকটেরিয়ার সমাধী মন্দির। কোন এক সময় গলব্লাডারে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছিল। সেই জীবাণু মারা যাওয়ার পর, তার মৃতদেহ ঘিরে কোলেস্টেরল জমতে থাকে, সেটাই পাথর হয়।

আমাদের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, ডা ডি কে রায় স্যার, পড়ানোর সময় এ নিয়ে মজা করতেন। স্যার বলতেন, একটা গলষ্টোন সব সময় পকেটে রাখবি।

স্ত্রী তাজমহল দেখানোর কথা বললেই , পকেট থেকে বের করে দেখাবি, এই হল মৃত ব্যাকটেরিয়ার তাজমহল।

এমনিতে এই গলষ্টোন খুব একটা বড় অসুখ নয়, একটা অপারেশন করলেই ঠিক হয়। কিন্তু খুব ছোট্ট একটা পাথর বেকায়দায় আটকে গেলে প্রাণঘাতী হতে পারে। আর এই ছোট্ট পাথরগুলিরই , পিত্ত থলি থেকে বেরিয়ে এসে , পিত্ত নালীতে আটকে মারাত্বক জটিলতা করার বিপদ থাকে। ওরা যত সময় পিত্ত থলির ভেতরে থাকে তেমন সমস্যা হয়না। স্থানচ্যুত হলেই বিপদ।

একই ভাবে কিডনির পাথরও স্থানচ্যুত হলেই সমস্যা বাড়ায়। হয়তো একটা একশ গ্রাম ওজনের পাথর কিডনীর ভেতরে বসে আছে, রুগী কিছুই বুঝবে না। কিন্তু একটা পাঁচ গ্রাম ওজনের পাথর নিচে নেমে এলে ভয়ংকর ব্যাথা হয়। এই দুরকম উদাহরনেই বুঝলাম, ‘ স্থান কাল পাত্রের’ গুরুত্ব কতোটা।

বছর কুড়ি আগে আমার দাঁতের গোড়া থেকে একটা পাথর বেরিয়ে গেল। দাঁতের ঐ জায়গাটা একেবারে ছুরির মত ধারালো হয়ে গেল। একটু জিভ নড়লেই কেটে যায়। নিজের হাসপাতালের দাঁতের ডাক্তারবাবুকে দেখালাম। যন্ত্র নেই, উনি কিছু করতে পারলেন না। এদিকে বিকেলেই মেদিনীপুরে যেতে হল। পরদিন , মেদিনীপুর শহরে আমার বন্ধু ডাক্তারের কাছে গেলাম। উনি মিনিট দশেক যন্ত্র দিয়ে ঘসে দাঁতের ধারালো জায়গাটা ঠিক করে দিলেন।

চোখের পাতার ভেতর দিকে একরকম পাথর হয়। চোখটা অবশ করে খুঁচিয়ে বের করতে হয়। অপারেশন বললে অনেকে ভয় পেয়ে যান, তাই ওটাকে অপারেশন না বলেও অনেক সময় কাজটা করতে হয়।

চোখের কথাই যখন এল , চোখে পাথর বা পাথরের চোখ নিয়ে কথাকটা বলেই নিই। পাথরের চোখ কি জানেন নিশ্চয়ই। এটা আসলে কোন চোখই নয়। কোন কারনে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলে, চোখের জায়গায় , চোখের মত দেখতে একটা পাথরের কৃত্রিম চোখ বসিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে ভালো লাগে। ঐ চোখ দিয়ে দেখা যায় না।

পাথর ছুঁড়ে মেরে কতো লোকের যে চোখ নষ্ট করা হয়েছে , সে মর্মান্তিক খবরগুলি আমরা চোখের ডাক্তাররা জানি। আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। লোকাল ট্রেনের জানালার পাশে বসে যাচ্ছিলেন এক যুবক। আমি ঠিক তার পাশেই বসে। হঠাৎ ফট্ করে একটা শব্দ হল। দেখি আমার পাশের যুবক হাত দিয়ে নিজের বাম চোখটা চেপে ধরেছে। হাতের তলা দিয়ে, গাল বেয়ে রক্ত বেরচ্ছে। ওর কাছে রুমালও নেই। আমার কাছে চশমা মোছার একটা কাপড় ছিল, তাই দিয়ে চেপে ধরতে বললাম। দেখলাম , ওর চোখে লাগেনি, চোখের ঠিক নিচে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। চোখে লাগেনি জেনে ও একটু আস্বস্ত হল। কাপড়টা দিয়ে একটু চেপে রাখতে বললাম।

পাথর না হলেও, একেবারে ঠিক চোখের নিচে, তুবড়ি ফেটে কেটে যাওয়া জায়গা সেলাই করতে গিয়ে, চামড়ার তলা থেকে তুবড়ির টুকরো বের করেছি।

পাথর তো আমদের জীবনের প্রায় সব জায়গার জরুরী হয়ে গেছে। বাড়ী তৈরীতে পাথর। এ নিয়েই একটা মোটা বই হয়ে যায়। রাস্তা তৈরীতে পাথর। পাথর ছাড়া রেল লাইন আমি দেখিনি।

বাড়ী তৈরির জন্য পাথর লাগে এ তো আমরা সবাই জানি; কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গার পর যে পাথর পাওয়া যায় , তার একটা পুরনো স্মৃতি আমার দীর্ঘ দিনের। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রথমে চলতো একটা টিনে ছাওয়া লম্বা পাকা বাড়িতে। পরে ছাদ ঢালা নতুন বাড়ী হলে , ঐ পুরনো বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ- পঞ্চাশ বছর আগে, একদিন সকালে , গ্রামের সব লোক শাবল ইত্যাদি নিয়ে বাড়িটা ভাঙ্গতে শুরু করল। ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝে, দেওয়াল, যে যা বয়ে নিতে পারে, নিয়ে গেল। ঐ রকম একটা পাথর, আসলে সিমেন্ট বালির তৈরী একটা মেঝের অংশ, আমাদের পুকুর ঘাটে বহু বছর ছিল। আমরা ঐ পাথরের উপর সাবান দিয়ে, জামা কাপড় কাচতাম।

এই পর্যন্ত লেখার পর, করোনার জনতা কারফিউ ইত্যাদির জন্য আর লেখা নিয়ে বসতে পারিনি। ঘরে বসে থাকলেও লেখায় মন বসাতে পারিনি। কত কিছুই লেখার ছিল ; এখন মনে হচ্ছে লেখাটা শেষ করতে পারলে বাঁচি।

আসলে পাথরের বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে শুধু একটা তালিকা তৈরী করলেও বিশাল আকার নেবে। মানব সভ্যতার প্রথম আবিস্কারও কিন্তু পাথর দিয়েই। পাথরে পাথর ঠুকেই প্রথম আগুন জ্বালানো হয়েছিল। আমার খুব ছোট বেলায়ও চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে দেখেছি।

কোলকাতার জাদুঘরে একটা বাটনা বাটা শিলের মত পাথর ছিল। একটা হাতলে চাপ দিলে পাথরটা বেঁকে যেত। বাটনা বাটা শিল আর নোড়া , এরাই বোধ হয় বাঙালীর সব থেকে বেশী ব্যবহার করা পাথর।

এই পাথর নিয়েই কী ভয়ানকর ভ্রান্ত ধারণা এখনও আছে ভাবা যায়না। আমি বছর দশেক আগেই জেনেছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক গ্রামে, এক বিখ্যাত মিশনের হাসপাতালে, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা হয় "বিষ পাথর" দিয়ে। যুক্তিবাদী সমিতি বহু ভাবে চেষ্টা করেছেন, এই মারাত্মক বুজরুকি বন্ধ করার। কি করে পারবেন? আমার এক শ্রদ্ধেয় আধিকারিক আমাকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে বোঝাচ্ছিলেন, ঐ বিষ পাথর কি ভাবে কাজ করে। এই ক'মাস আগেই, উত্তরাখণ্ডের এক সাংসদ, প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ওখানকার এক নদীর পাথর দিয়ে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করলে, নিশ্চিত ফল! এসব কথা উন্নত দেশে বললে, এদের পাগলা গারদে ঢুকিয়ে রাখবে।

এবার সত্যি কথাটা বলি। একটা পাথর নিয়ে বলতে গিয়ে , এতটা গৌরচন্দ্রিকা করলাম। আমার টেবিলে একটা কাগজ চাপা দেওয়ার পাথর আছে। ওটা রুদ্র প্রয়াগে বেড়াতে গিয়ে নদীর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। বেড়ানোর জায়গার স্মৃতি হিসেবেই ওটাকে আনা।

স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই তো বহু যুগ থেকে পাথরকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব এর শিলালিপি , শ্বেতপাথরের তাজমহল, কিংবা আমার গ্রামের পাকাঘাট। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখতাম, গ্রামের হাসপাতালের পাশের পুকুরে সুন্দর বাঁধানো ঘাট। গ্রামের সবাই বলতাম, পাকাঘাট। সেই ঘাটে ছোট মার্বেল পাথরে লেখা, স্বর্গিয় শশীভূষণ সামন্তর স্মৃতি রক্ষার্থে , তদীয় পুত্র পতিত পাবন সামন্ত কর্তৃক , সর্ব্বসাধারনের জন্য। সেই পতিতদাই স্বর্গত হয়েছেন বছর পনের হল। আগামী প্রজন্ম পতিতদাকেই চিনবে না।

আমাদের কৈশোরের ব্রজভূমী পাকাঘাট , এখনও আছে। বছর কুড়ি –পঁচিশ ওদিকে যাওয়া হয়নি। শেষ যখন দেখেছিলাম তখনই বেশ অযত্নে ছিল। শশীভূশণবাবুর সেই স্মৃতিফলক আজও আছে কিনা জানিনা। নাই বা থাকল; আমদের কৈশোরের স্বপ্নমাখা পাকাঘাট, স্মৃতিতেই থাক চির উজ্জল হয়ে। একটা ক্ষয়ে যাওয়া মার্বেল পাথরের খোঁজে আর নাই বা গেলাম।
(২৮.৩.২০২০)

আরও ছুটি চাই

আজ সকাল সাড়ে সাতটার পর হঠাৎ করেই আমাদের হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ভিড় জমে গেল। সাধারণত এই সময় এক দুজন করে রুগী আসে। আমাদের একজন হাউস স্টাফ বসে তাদের কথা শুনে , কাউকে ভর্তি করে বা বড় ডাক্তারদের কাছে পাঠায়। আমি রাতের ডিউটি সেরে ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, পরের ডাক্তার এলেই বাড়ী রওনা দেব। এমন সময় একজন কর্মী এসে বলল, স্যার , ইমারজেন্সিতে খুব ভিড় জমে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে দেখি, হাউস স্টাফ –এর সামনে কুড়ি বাইশ জন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এবার আমরা দুজনেই এক এক করে রুগীর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি, কুড়ি জনের মধ্যে দু তিন জন নতুন রুগী। বাকি সতের আঠারো জনই , আউটডোর -এর কাগজ দেখাচ্ছে। তারা দূর দূর থেকে এসেছে। এসে শুনছে, “আজ ছুটি”, আউট ডোর খুলবে না। আমাদেরই অনুরোধ করছে, কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকেই অপরাধী আর অসহায় লাগছিল। এই যে লোকগুলি একটা বড় হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে আসে, এদের কেউ কেউ হয়তো তিন মাস, ছয় মাস এমনকি এক বছর ধরে আসছে যাচ্ছে। আর যাদের অপারেশন -এর দরকার, তারা হয়তো বার চারেকের চেষ্টায়, সবকটা পরীক্ষা করিয়ে , আজ ভর্তির আশায় এসেছে।

আরও কত রকমের সমস্যা , যেগুলি আউটডোরে বসে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষক চিকিৎসকেরাই দেখেন। এই সকল রুগীদের জন্য আমাদের মত ডাক্তার দু’ একজন হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে বসে , " সোমবার আসুন" বলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। একজন রুগীর কাগপত্রগুলো দেখে বুঝলাম , তাকে সম্ভবত আমার থেকেও বেশী অভিজ্ঞ কোন ডাক্তাবাবু কয়েকবার দেখেছেন। কাকদ্বীপ থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন , হার্টের কিছু আধুনিক পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আজ হার্টের আউটডোর বন্ধ, আর একদিন আসতে হবে, এই মর্মান্তিক সংবাদটি শুনতে এই রুগীর বাড়ীর লোকের কেমন লাগছে , বুঝতেই পারছিলাম। আমার পাশে বসে আমাদের হাউসস্টাফ এই কথা যখন বলছে, তখন আমি সম্ভবত একজন হাতের প্লাস্টার কাটাতে আসা রুগীর বাড়ীর লোকের সাথে কথা বলছিলাম। আমাদের সামনে তখনো দশ -পনের জন লোক দাঁড়িয়ে ধাক্কা ধাক্কি করছে। তাদের পিছনে একটি বাচ্চাকে মায়ের কোলে বসে , চিৎকার করে কাঁদতে দেখলাম। এই বাচ্চার দু’ হাতেই বড় বড় ফোস্কা পড়ে আছে, পোড়া রুগী, দশ ফুট দূরের থেকেই দেখতে পাচ্ছি। চিৎকার করে , বাচ্চার বাড়ীর লোককে সামনে আসতে বললাম। বাচ্চাকে নাম লিখে, টিকিট দিয়ে , সার্জিক্যাল বিভাগে পাঠানোর সময় আমার মন পড়ে আছে, সেই কাকদ্বীপ থেকে আসা হার্টের রুগীর দিকে। অন্য বাড়ীর পাঁচ তলায় অবস্থিত হার্টের বিভাগে, ওদের ইমার্জেন্সী দেখার জন্য একজন থাকেন; হাউস স্টাফকে বললাম, একে একটা ইমার্জেন্সী টিকিট দিয়ে একবার পাঁচ তলায় পাঠাও। আমাদের হিসেবে যাকে ইমার্জেন্সী বলে, এই রুগী এরকম নয়, না বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, অনেক সময় , ঐ রকম চার তলা পাঁচ তলায় বসে থাকা, আমার থেকে তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের ছোট ডাক্তারও ফোনে, কিংবা নেমে এসে রীতিমত ধমক দেওয়ার চেষ্টা করে, কেন এসব রুগীকে পাঠিয়েছি, জানতে চায়!

এই হল একটা ছুটির দিনে সকাল সাড়ে সাতটার পর মিনিট চল্লিশ -এর সামান্য একটু অংশ। আমার পরে ডিউটিতে এলেন যে লেডি ডাক্তার, তিনি তিন মাস পর অবসর নেবেন; অর্থাৎ তার বয়স চৌষট্টি বছর নয় মাস। আমি জানি, ছুটির দিনে বেলা প্রায় একটা দেড়টা পর্যন্ত আউটডোরে দেখাতে আসা রুগীদের চার আনাও যদি একবার করে ইমারজেন্সি ঘুরে যায়, ঐ ম্যাডাম আর এক হাউস স্টাফ তাদের প্রত্যেকের সাথে আধ মিনিট করে কথা বললেও, মাঝে মাঝেই তিরিশ চল্লিশ জনের ভিড় জমে যাবে। প্রতি রবিবার সকালে, এর অর্ধেক ভিড় জমে। এই কুড়ি থেকে তিরিশ জনের সাথে কম করে দু'জন করে বাড়ীর লোক থাকেই। অর্থাৎ সব সময় পঞ্চাশ থেকে সত্তর জন লোকের জমায়েত। এর মধ্যেও অতি সংকটজনক রুগী থাকে। সামনে ভিড় করে থাকা পঞ্চাশ জনকে পেরিয়ে , ডাক্তারের কাছে গিয়ে , আমার রুগীকে একটু দেখুন বলবার আগেই অনেক সময় রুগী মারাই যায়।

এসব কিন্তু রুগী বা রোগ নিয়ে কথা। এর বাইরে কত বিচিত্র রকমের কাজ ঐ হাসপতালের ইমারজেন্সির ডাক্তারদের করতে হয় , লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আমার প্রয়াত বন্ধু ডা ভোলানাথ রায় এসব কাজকে বলতেন , পঞ্চায়েতী কাজ। ছুটির দিনে হাসপাতালের আপিস বন্ধ থাকে, তাই পঞ্চায়েতী কাজ আরও বেড়ে যায়। বারো মাস , তিনশ পঁয়ষট্টি দিন , মারামারি করে সরকারী হাসপাতালের কাগজ নিতে আসা লোকের অভাব হয় না। চিকিৎসার দরকার নেই, রিপোর্টটা লিখে দিন, আগে থানায় যাই; এমন লোকই বেশী । যে যে ছুটির আগের সন্ধ্যায় মদের দোকানে লম্বা লাইন পড়ে, সেই সেই ছুটিতে হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে পঞ্চায়েতী কাজও বেড়ে যায়।

এত কিছু একটা ছুটির দিন নিয়ে লিখছি কেন? আর হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও কি ছুটি থাকে না? ছুটি আসলে হাসপাতালে থাকেই না প্রায়। দুর্গা পূজার মহাষ্টমী, বড়দিন, ঈদ এরকম মোট সাত কি আট দিন হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকে। বাকি সরকারি ছুটির দিনে হাসপাতালের আপিস বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ডাক্তারকে পঞ্চায়েতী বেশী করতে হয়। "ডাক্তার তো সরকারের পয়সায় তৈরী, লাখ লাখ টাকা রোজগার করে , মাঝে মাঝে বেশী কাজ করতে হলে করবে"। এই তো শতকরা নিরানব্বই জন লোকের বক্তব্য। আমি কিন্তু ছুটি থাকলে ডাক্তারদের কি কি অসুবিধা হয় সেকথা লিখতে বসিনি। আমি টেবিলের উলটো দিক বা জানালার বাইরে থেকে লোকগুলি কি ভাবে, কি অবস্থায় পড়ে, বা কি রকম হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়, সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আমি নিজে হাসপতালে কাজ করি, তাই হাসপতালের খবরটা ভালো জানি। কিন্তু ছুটি থাকলে সাধারণ জনগনের ঠিক কতোটা সুবিধা হয় আর অসুবিধাই বা কতোটা সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। সরকারি আপিস আর স্কুল কলেজ ছুটি থাকলে কার কি সুবিধা অসুবিধা হয়? পূজার ছুটি বললে আমরা দুর্গা পূজার ছুটিই বুঝি। খেয়াল করে দেখেছেন কি, সরকারী আপিসে পূজার ছুটি আসছে আসছে করেই কতোদিন আগে থেকেই কাজ কর্ম সব আটকে

থাকে? তারপর মহালয়া থেকেই দুর্গা পূজা শুরু হওয়ার মত , সরকারী ভাবেই পূজার ছুটি ক্রমশ বাড়ছে আর বাড়ছে। পূজার ছুটি বাদেও সরকারী আপিসগুলিতে বছরে বাহান্নটা রবিবার ছাড়াও আরও কতগুলি ছুটির দিন থাকে, গুনে দেখেছেন?

রবিবার সকাল বা যে কোন সরকারী ছুটির দিনে শহরতলীর রেল গাড়ীতে চেপে দেখেছেন কোনদিন? রেলের ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী রবিবার আর সরকারী ছুটির দিন অনেক শহরতলীর লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকে। আমি গত কুড়ি বছর ধরে শহরতলীর লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করছি। একটা ট্রেন বাতিল থাকলেই পরের ট্রেনে ওঠাই মুস্কিল।

ছুটির দরকার সবার আছে। ডাক্তার, পুলিশ, বাস ট্রেনের ড্রাইভার কন্ডাকটর , এরা সবাই যদি আপনার মত ছুটির দিনে কাজে না যায়, কি অবস্থাটা হবে কখনো ভেবে দেখেছেন? দিন দিন কর্মীর সংখ্যা কমছে, জনসংখ্যা বাড়ছে। কয়েক বছর ধরে নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। অতি সামান্য প্রথা বা পূজা পার্বনেও ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে মহাত্মা, মহানায়কের কোন অভাব কোনদিন ছিল না। নতুন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে; ঐ সব মহান মানুষগুলির জন্মদিনে তাদের সম্মান দেখাতে ছুটি ঘোষণা। কোন মহান মানুষ, কাজ না করে শুধু ছুটি উপভোগ করে দেশের উন্নতি হয়, এমন কথা বলে গেছেন কি?